হ্যান্স এন্ডারসনের সেরা রূপকথা

www.pathagar.com

চিরায়ত গ্রন্থমালা

www.pathagar.com

হ্যান্স এন্ডারসনের সেরা রূপকথা

সম্পাদনা
আমীরুল ইসলাম

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

www.pathagar.com

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ৯৩

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
ফাল্গুন ১৩৯৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২

চতুর্থ সংস্করণ একাদশ মুদ্রণ
ফাল্গুন ১৪১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
নিজাম প্রিন্টার্স এ্যান্ড প্যাকেজেস
২৪, পুরানা পল্টন লেন, ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ
রফিকুন নবী

অলংকরণ
ধ্রুব এষ

মূল্য
আশি টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0092-6

www.pathagar.com

গল্প পাঠের আগে

হ্যান্স এন্ডারসনের নাম কে না জানে!

শিশুসাহিত্যের অমর জাদুকর, রূপকথার নিপুণ স্রষ্টা, মায়াবী, মধুর দুঃখরঞ্জিত সুখের জগতের নির্মাতা এই মহান লেখক জন্মগ্রহণ করেন ডেনমার্কের কোপেনহেগেন শহরে, ১৮০৫ সালের ২ এপ্রিল। প্রায় একশ বছর ধরে পৃথিবীবাসীদের রূপে, গুণে, রসে বিমুগ্ধ করে রেখেছেন তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর, অশ্রুতপূর্ব, অনির্বচনীয় সব রূপকথা দিয়ে।

রূপকথা অর্থ কী!

স্বপ্ন ও বাস্তবের মোহন এক জগৎ। আশ্চর্য রকমের সুন্দর এক কল্পলোক। কী থাকে না সেখানে, সুন্দরের আড়ালে অসুন্দর, হাসির আড়ালে কান্না, মিথ্যার আড়ালে সত্যি, আনন্দের পাশে বেদনা—এই হচ্ছে রূপকথা, চিরকালীন সৌন্দর্যের এক অমলিন চিত্র।

এন্ডারসন সেইসব রূপকথা লিখেছিলেন যা পড়ে আজও বিস্মিত হই আমরা। সোনার কাঠির অনুপম নৃত্যে ঘুম ভাঙে আমাদের। প্রবেশ করি স্বর্গীয় উদ্যানে—যেখানে সীমাহীন কল্পনা, অন্তহীন স্বপ্ন ও কঠিন বাস্তবতা।

রূপকথার মতোই—এন্ডারসনের জীবনকাহিনী। লাজুক, ভীরু, সংকুচিত, স্পর্শকাতর, নম্র এবং চরম নিঃসঙ্গ এক মানুষ। ছেলেবেলায় একা, পিতৃহীন, স্নেহবঞ্চিত শৈশব। প্রতিভাবান—তাই জীবনসংগ্রামের পথে তাঁর দীর্ঘ পরিক্রমা। নাটকে অভিনয় করতে আগ্রহ, মঞ্চে গান গাওয়ার ইচ্ছা, নৃত্যশিল্পী হবার আকাঙ্ক্ষা, কবিতা রচনার চেষ্টা, চিত্রশিল্পী হওয়ার সাধনা—সবক'টা মাধ্যমেই সময়ক্ষেপণ করলেন। ব্যর্থতার যন্ত্রণা স্কন্ধে নিয়ে সাহিত্যসাধনার সূত্রপাত—লিখলেন উপন্যাস, গল্প-কবিতা, ভ্রমণকাহিনী। এছাড়াও বহু বিচিত্র বিষয় তাঁর উপজীব্য। এর ফাঁকে এন্ডারসন লিখেছেন রূপকথা। অনেকটাই খেলাচ্ছলে, স্বাদ বদলানোর সাধু প্রক্রিয়ায়।

www.pathagar.com

কিন্তু আশ্চর্য, সেই গুরুত্বহীন রচনাসমগ্রই বিশ্বখ্যাত করল তাঁকে। রূপকথার জগতের সোনালি সিংহাসনে একচ্ছত্র আধিপত্য হল তাঁর। তিনি পেলেন প্রভূত সম্মান, পুরস্কার—সর্বস্তরের মানুষের আদরণীয়, বরণীয়, পূজনীয়। বেঁচে থাকতেই এন্ডারসন কিংবদন্তীতুল্য সম্মান ও খ্যাতি পেলেন। জয় করলেন শিশুদের বিচিত্র মনোজগৎ। ১৮৩৫ থেকে ১৮৭২ সাল। অন্যান্য লেখালেখির ফাঁকে এই সময়কালে মোট ১৬৮টি রূপকথা রচনা করেন তিনি। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের অলঙ্কারে মহিমান্বিত হয়ে আছে মৌলিক এই রূপকথার মায়াবী স্বাদ থেকে।

কয়েকটি গল্প নিয়ে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত হল এই সংকলন। অনেকটাই অসম্পূর্ণ, কিন্তু আমরা চেয়েছি—এন্ডারসনের রূপকথার সোনালি একটি ছবি যেন অঙ্কন করা যায়। সেরা গল্পগুলো যেন থাকে এই সংকলনে। বইটি পাঠকদের ভালো লাগবে—এই প্রত্যাশা।

আর শিশুকিশোর পাঠকবন্ধুরা—

এন্ডারসনের রূপকথার অনিন্দ্য জগতে প্রবেশ করে তোমরা অবনত হও সেই নিঃসঙ্গ মানুষটির প্রতি, যিনি আমৃত্যু জগতের সকল শিশুদের পরম মমতায় ভালোবেসেছেন। গভীর ভালোবাসায় নির্মাণ করেছেন একেকটি অমর রূপকথা।

আমীরুল ইসলাম
৫৫ গোলারটেক, মিরপুর, ঢাকা

www.pathagar.com

সূচিপত্র

কুচ্ছিৎ প্যাঁকারু ৯
অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু
রাজার নতুন পোশাক ১৮
অনুবাদ : হায়াৎ মামুদ
নববর্ষে মৃত কিশোরী ২২
অনুবাদ : হায়াৎ মামুদ
তুষার রানি ২৫
অনুবাদ : আবদুন নূর
ছোট্ট জলকন্যা ৪৯
অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু
মায়া তোরঙ ৬৬
অনুবাদ : আবদুন নূর

www.pathagar.com

কুচ্ছিৎ প্যাঁকারু

সারা দেশ কী অপরূপ মনে হচ্ছে! গরমের সময় গমের ক্ষেত হলুদবর্ণ হয়ে আছে, জইক্ষেত সব সবুজ; শুকনো খড়কুটো মাঠের মধ্যে জড়ো করে রাখা হয়েছে, বকগুলো লম্বা লম্বা ঠ্যাং নিয়ে ঠুকঠুক্ করে হেঁটে বেড়াচ্ছে আর কথা বলছে মিশরি ভাষায়—মা'র কাছ থেকে তারা এ-ভাষাই রপ্ত করেছে কিনা তাই। সামনের মাঠ আর ক্ষেতের একদিক দিয়ে সবুজ বনানীর সারি চলে গেছে দিগন্ত ছুঁয়ে; ঐ বনের মধ্যে এক গভীর স্বচ্ছ সরোবর! সত্যিই, চারদিকে কী অপরূপ শোভা! অনেক পুরনো একটা বাড়ি, সূর্যালোকে বড়ো চমৎকার দেখাচ্ছে; বাড়িটার চারদিক ঘিরে খাল চলে গেছে। প্রাচীর থেকে খালের কিনারা পর্যন্ত এক ধরনের বুনো লতাপাতার গাছ, বার্ডক্ লতা ভর্তি হয়ে আছে; ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ঐ লতাপাতার জঙ্গলে খেলা করে, দোলনা বানিয়ে দোলে, তার মধ্যে লুকোচুরি খেলে অনায়াসে। এই জায়গাটা এমন বুনো আর চুপচাপ যে একে ঐ দিগন্তছোঁয়া বনভূমির গভীরে কোনো স্থান বলে ভ্রম হয়। আর ঠিক সেজন্যই একটা পাতিহাঁস ওখানটায় তার বাসস্থানের উপযুক্ত ভেবে বাসা তৈরি করেছে। হাঁসটি তার ডিমের উপরে বসে ছিল। বেশ কিছুদিন ধরে সে এখানে আছে, ফলে আজকাল তার আর মোটেই ভালো লাগছে না এখানে থাকতে। কেননা, বন্ধুবান্ধব পাড়াপড়শিরা কেউই প্রায় আজকাল দেখাসাক্ষাৎ করতে আসে না—এই খালের এরকম পিছল নির্জন স্থানে এসে তার সাথে ফিসফাস গুজগাজ করার চেয়ে বরং খালের পানিতে সাঁতরানো অনেক বেশি আনন্দকর বলে তারা মনে করে।

কিন্তু কী আর করা যাবে? হাঁস বেচারা দিনের পর দিন ডিমে তা দেওয়ার জন্যে বসে রইল। অবশেষে সেই সময় এসে গেল যখন ফাটল ধরল ডিমে তার, একটা-একটা করে

www.pathagar.com

নতুন মুখ ডিমের ভিতর থেকে উঁকি দিতে লাগল। 'প্যাঁক্ প্যাক্—প্যাঁক্ প্যাঁক্' : তাদের গলা থেকে মিহি মিষ্টি আওয়াজ বেরুচ্ছে, সাধ্যমতো চলতে ফিরতে চেষ্টা করছে সবাই, সবুজ লতাপাতার ফাঁক দিয়ে কেউ কেউ বাইরে উঁকিঝুঁকিও মারতে লাগল।

"ঈশ্, দুনিয়াটা কত্তো বড়ো!" ছোট্ট একটি বাচ্চা হাঁস অবাক হয়ে বলে উঠল।

"ওমা, বলে কী দেখ! দুনিয়াটা বুঝি এটুকুই ভেবেছিস?" পাতিহাঁসগুলোর মা উত্তর দেয়, "এই পৃথিবীটা অনেক অ-নে-ক বড়ো। এই বাগানের ওদিকে যে-মাঠ, তা ছাড়িয়েও অনেক দূর—। অবশ্য আমি কখনো অদ্দূর যাইনি।" তারপরেই হেঁকে উঠল, "বলি, বাছারা, তোরা সব ঠিকঠাক আছিস তো? এদিক-ওদিক আবার চলে যাস না যেন।" এ-কথা বলে উঠে দাঁড়াল সে। "নাঃ, আমি তো এখনো আমার সব ক'টিকে পাইনি। সবচেয়ে বড়ো ডিমটা আমার এখনো বাকি। কবে যে ফুটবে আল্লাই মালুম। আর ছাই ভালো লাগছে না, বিরক্ত ধরে গেল।" আবার সে বসে পড়ে সেখানে।

এক বুড়ি হাঁস বেড়াতে এসেছে। বান্ধবীকে একটু দেখে যাবে আর কী। সে জিজ্ঞেস করল, "কি দিদি, কেমন আছিস লো?"

"আর বলো না বাপু, এই একটা ডিম নিয়ে বড়ো মুশকিলে পড়েছি। না এটা ভাঙে, না আমি একটু ঘুরেফিরে বেড়াতে পারি। কিন্তু তুমি আমার বাচ্চাগুলোকে দেখেছ তো দিদি? এত সোন্দর ছেলেপুলে আমার এতখানি বয়সে আমি কখনো দেখিনি।"

"শোন, শোন, কী বলছিস তুই? তাহলে নির্ঘাৎ এটা একটা টার্কির ডিম। আমিও একবার ঠিক এমনিভাবেই ঠকেছিলাম; বাচ্চাদের নিয়ে তোর মতোই সেবার যন্ত্রণার একশেষ হয়েছিল। তাছাড়া এই টার্কিগুলো পানি দেখলেই এত ভয় পায় যে পানির ধারেকাছে ঘেঁষবে না। আমি কতো ডেকেছি, মারব-ধরব করেছি, কিন্তু যে কে সে-ই, কোনো কাজ হয়নি। আচ্ছা দেখি, ডিমটা দেখা তো। হুঁ, হুঁ, ঠিক যা ভেবেছি—, টার্কিরই ডিম। বাদ দে এইসব; তুই বরং এই বাচ্চাগুলোকেই সাঁতার শেখা গে।"

"না গো, আর কয়েকটা দিন দেখি না, দিদি," হাঁস জবাব দেয়, এদ্দিনই যখন তা দিলাম, আর দু'-এক দিনে কীই-বা ক্ষতি হবে?"

"জানি না, বাপু। এটা তোমার ব্যাপার, তুমি বোঝো গে—" বুড়ি হাঁস উত্তর দিল, তারপর হেলেদুলে থুপথুপ করে চলে গেল নিজের কাজে।

বড়ো ডিমটা, যাক্, শেষকালে ভাঙল। পিঁ পিঁ—আওয়াজ বেরুল ডিমটার ভিতর থেকে, আর সে—ছোট্ট পোনা হাঁস—হুড়মুড় করে ডিম ভেঙে বেরিয়ে এল বাইরে। এহ্-হে, কী কদাকার। কী বিরাট দেখতে! মা তার এই শিশুটির দিকে তাকিয়ে রইল। "দেখতে বেশ বড়োসড়ো, আর শক্তসমর্থ মনে হচ্ছে," মনে মনে বলতে থাকে সে, "আমার কোনো বাচ্চাই তো এরকম নয়। তাহলে কি সত্যিই এটা একটা টার্কির ছানা? ঠিক আছে, শিগ্‌গিরই বুঝতে পারব। পানিতে তো নামতেই হবে সকলকে, বাছাকে আমার ঠেলেঠুলে নিয়ে যাবই; তারপর দেখব কী হয়।"

পরদিন আবহাওয়া বড়ো সুন্দর ছিল। সবুজ লতাপাতায় সোনালি সূর্য ঝিকমিক করছে। হাঁসটি তার সব বাচ্চাকে নিয়ে খালের ধারে গেল। ঝপাৎ! ঝাঁপ দিয়ে পড়ল সে পানিতে। "প্যাঁক্-প্যাঁক্, প্যাঁক্-প্যাঁক্—" সে ডাকতে থাকে তার বাচ্চাগুলোকে, আর একটার পর একটা পোনা হাঁস ঝাঁপ দিয়ে পড়তে লাগল পানির বুকে। ঝাঁপিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পানিতে ডুবে গেল, কিন্তু পরক্ষণেই পানির ভিতর থেকে মাথা তুলে ধরল আর কী

www.pathagar.com

সহজভাবেই–না সাঁতার কাটতে লাগল। সব কটি পোনা হাঁসই সেখানে রয়েছে, এমনকি কুচ্ছিৎ মেটে রংয়ের পোনাটিও অন্যগুলোর সঙ্গে কী আনন্দে সাঁতার কাটছে।

"নাহ্, তাহলে এ তো টার্কি নয়।" তাদের মা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল; "দেখ, দেখ, কী সুন্দর পা ফেলাচ্ছে, মাথাটি কেমন উঁচু করে ধরে রেখেছে পানির ওপরে। আমারই বাচ্চা তো, হবে না কেন! আর ভালো করে তাকিয়ে দেখলে মোটামুটি সুন্দরই তো দেখতে। প্যাঁক্–প্যাঁক্, বাছারা, আমার কাছে আয় দেখি তোরা—দুনিয়াটা একটু ঘুরিয়ে–ফিরিয়ে দেখাই গে তোদের। দেখিস্, আমার কাছেপিঠে থাকিস সবসময়, বেতালে যেন কেউ মাড়িয়ে না দ্যায়; আর খবরদার বিড়াল থেকে কিন্তু সাবধান।" তারা হাঁটতে হাঁটতে খামারবাড়ির হাঁসপট্টিতে এল। দুটো পাতিহাঁস পরিবার একটা বাইন মাছের মাথা নিয়ে ঝগড়া করছে। মাছটার আবার লেজ নেই, সেটা একটা বিড়াল নিয়ে পালিয়েছে।

"দেখেছিস? দুনিয়ার হালচাল দেখতে পাচ্ছিস কী রকম?" মা হাঁসটি হাঁসপরিবার দুটোর ঝগড়া দেখে বলে উঠল বাচ্চাগুলোকে। তারপর ঠোঁটটা পরিষ্কার করল ভালোভাবে; ঝলসানো বাইন মাছ তারও খুব প্রিয়। "বাছারা, তোরা শোন"—মা ফের হাঁক দিয়ে ওঠে, "এখন পায়ের ব্যবহার শিখে নে দেখি। পা দুটো লাগিয়ে জোড় পায়ে দাঁড়াও; হ্যাঁ, ঠিক আছে,—এইবার মাথা নুইয়ে সালাম করো বুড়ি দিদিমাকে। এই এলাকায় ইনিই সবচেয়ে অভিজাত, হিম্পনি রক্ত যে তাঁর শরীরে বইছে তা চেহারা চাল–চলন আর ব্যবহার দেখলেই সকলে বোঝে। আর ভালো মতো নজর দিয়ে দেখে নে তোরা—এঁর পায়ে একটা লাল ফেটি বাঁধা, এটা তাঁর বিশেষ খান্দানির পরিচয় দ্যায়, একটা পাতিহাঁসের জন্যে এর চেয়ে সম্মানের আর কিছু নেই।"

অন্যান্য হাঁস যারা খামারে চরে বেড়াচ্ছিল তারা এবার তাকিয়ে দেখল এদের, চেঁচাতে লাগল, "আরে দেখ, দেখ, নতুন একদল পোনা হাঁস এসেছে।" তারপর ওর দিকে চোখ পড়তেই চেঁচিয়ে উঠল, "ঈশ্, কী জঘন্য! এই পোনাটা কী বিচ্ছিরি রে দেখতে! আমরা একে দলে নেব না।" আর এ–কথা শেষ হবার সাথে সাথে একজন উড়ে গেল ওর দিকে, গিয়েই ঘাড় কামড়ে ধরল বেচারা কুচ্ছিৎ প্যাঁকারুর।

"আহা–হা, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। ও তো কোনো ক্ষতি করেনি তোমাদের।" মা বেচারা ধমকে ওঠে তাদের।

"তা বটে! কিন্তু কী রকম বিরাট ঢ্যাপসা আর কুচ্ছিৎ ওটা দেখতে!"

পায়ে লাল ফেটি বাঁধা বৃদ্ধা হাঁসটি বলে উঠল, "খুব সুন্দর বাচ্চা তো এগুলো। একটাই যা সামান্য একটু দেখতে খারাপ, ফলে সবাই একটু ট্যারচা চোখে একে দেখবে বটে, তবে আমার মনে হয়—এদের মা ইচ্ছে করলেই একে মেজেঘষে খানিক সুন্দর করে তুলতে পারে।"

পাতিহাঁসগুলোর মা জবাব দিল, "ঠিকই বলেছ তুমি, বুড়ি মা। আমার এই পোনাটা দেখতে সুবিধের হয়নি, কিন্তু তা হলে কী হয়—এ আমার বড়ো লক্ষ্মী ছেলে, এত সুন্দর সাঁতার দিতে পারে যে কী বলব! সকলের চেয়ে এই তো ভালো সাঁতার দ্যায়। আমার ধারণা, আরেকটু বয়েস হলে দেখতে অন্যদের মতোই হবে, আর হয়তো তখন একটু ছোটোই দেখাবে একে।" এই বলে সে তার বাচ্চার ঘাড় আদর করে চুলকে দিতে লাগল, উঁচু হয়ে থাকা এলোমেলো পালকগুলো মোলায়েম করে আঁচড়ে দিল। তারপর বলল, "তা ছাড়া, এ তো মেয়ে নয়, খোকা। একটু শক্তসমর্থ হওয়াই দরকার। বেশ জোয়ানমর্দ হয়ে সারা জীবন সংগ্রাম করে যাবে, আমি তা–ই চাই।"

www.pathagar.com

"আচ্ছা, বাছারা, তোমরা এখন এস।" বুড়ি দিদিমা হাঁসটি উপদেশ দেয় সকলকে। "তোমার বাচ্চাগুলো বড়োই সুন্দর হয়েছে দেখতে। ভালো কথা, যদি বাইন মাছের মাথা দেখতে পাও কেউ, নিয়ে এসো আমার কাছে, কেমন?"

অতএব এখন সকলে তারা ঘরে ফিরে চলল।

আহা, বেচারা ছোট্ট পোনা হাঁস, বেচারি প্যাঁকারু! ডিম ফুটে সবচেয়ে শেষে বেরিয়েছে, দেখতে কুচ্ছিৎ—বেচারাকে সব হাঁস আর মুরগি মিলে যখন-তখন ঠোকরাচ্ছে, খোঁচাচ্ছে, সবসময় বিরক্ত-ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে। আর একটা টার্কি মোরগ—তার পায়ে আবার নখের আঙটা। এতেই তার এত দেমাগ যে সে নিজেকে লাটবেলাট ভাবে: রাস্তা হাঁটে ফুলেফুলে, যেন ভরা পাল জাহাজ একটা ভেসে যাচ্ছে। সে রাগে লাল হয়ে ঠক্‌ঠক্ করতে করতে বেচারা পোনা প্যাঁকারুর পানে তেড়ে যায়। আর সে? বুঝতেই পারে না এ রকম অবস্থায় কী করা উচিত বা কী করতে হয়; তার বদখৎ চেহারার জন্যে সর্বদা সে মনমরা হয়ে পড়ে থাকে।

প্রথম দিনটা তো এভাবেই কাটল, আর তার পর থেকে যত দিন যেতে লাগল ব্যাপারটা খারাপের দিকেই গেল। নিজের আপন ভাইবোনগুলো পর্যন্ত তার সাথে যাচ্ছেতাই নিষ্ঠুর ব্যবহার করে, প্রায়ই গালমন্দ করে অভিশাপ দ্যায় : "হোঁদলকুৎকুৎ, তোকে বিল্লীতেও দেখতে পায় না?" আর প্যাঁকারুর মা, তারও মনে কি শান্তি আছে? সে ভাবে, এমন বিশ্রী ছেলে তার না হলেই ভালো ছিল। অন্যান্য হাঁসগুলো যখন-তখন মন গেলেই সমানে মারধোর করছে, মুরগিগুলো ঠুকরে দিচ্ছে, আর যে-মেয়েটা হাঁস-মুরগিদের খেতে দ্যায় সে সারাক্ষণই লাথি-ঝাঁটার ওপরে রেখেছে তাকে।

মারধোরের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে একদিন সে লুকোতে গেল। একটা ঝোপঝাড় দেখে যেই সে ঢুকেছে অমনি কতকগুলো পাখি ভয় পেয়ে কিচিরমিচির করতে করতে উড়ে পালাল। "ঈশ্, আমি দেখতে এতই খারাপ যে এরা পর্যন্ত ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল"—ভাবল সে। মন খারাপ হয়ে গেল তার, তখন সে ঝোপ থেকে বেরিয়ে সোজা এক দিকে—যে দিকে দু-চোখ যায়—হাঁটতে শুরু করে। মনের দুঃখে সে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই, যাচ্ছে, যাচ্ছে, যাচ্ছে....। অবশেষে এসে থামল এক জায়গায়; দেখল, সামনেই একটা বিল। অনেক বুনো হাঁস সেখানে। সারা রাত সে পড়ে থাকল বিলের মধ্যে, শোকেদুঃখে তখন সে খুবই ক্লান্ত। সকালে বুনো হাঁসের দল যখন আকাশে উড়ল তখন দেখতে পেল যে, তাদের এক নতুন সঙ্গী এসেছে। "কে হে বাপু তুমি?" জিজ্ঞেস করে তারা। প্যাঁকারু খুবই বিনীতভাবে আলাপ করল তাদের সাথে।

অবশেষে বুনো হাঁসগুলো বলল, "তোমার চেহারাটা দেখতে খারাপ বটে! তবে তাতে কী? তুমি আমাদের বংশে বিয়ে-থা না করতে চাইলেই হল।"

বলে কী! বিয়ে-থা? সে তো এ সব ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করে না। তার কেবল ইচ্ছা : এই বিলের শাপলা-কলমিদামের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে শুয়ে থাকবে, এই বিলের স্বচ্ছ তরল জল পান করবে। পুরো দুটো দিন প্যাঁকারু রইল এই জলাশয়ে। তৃতীয় দিনে কোথা থেকে উড়ে এল দুই বুনো বালিহাঁস—না, বালিহাঁস ঠিক বলা চলে না, বয়েস খুবই কম তাদের, বরং বলা চলে বালিহাঁসের পোনা। ডিম ফুটে বের হয়েছে তারা বেশি দিন হয়নি; আর তাইতেই ছেলে-ছোকরাদের চ্যাংড়ামি তাদের স্বভাবে তখনো রয়ে গেছে।

"হে-ই!" বুনো বালিহাঁসের পোনা দুটো তাকেই ডাকছে যেন। তারা বলছে, "ওহে, এদিক পানে একটু শুনে যাও তো বাপু। দেখতে তুমি বড়োই বদখৎ, আর সে জন্যেই

www.pathagar.com

তোমাকে খু-উ-ব ভালো লাগছে আমাদের। তুমি আমাদের সঙ্গে আসবে নাকি? এখান থেকে সেখান অবিরাম ঘুরে বেড়াবে আমাদের সাথে? ঐ দিকে আরেকটা বিল আছে, এখান থেকে বেশি দূরে নয়। সেখানে খুব চমৎকার কিছু বুনো পাতিহাঁস আছে, এত সুন্দর যে কী বলব! তারা কেবলই শিস্ দ্যায় স্-স্-স্-, স্-স্-স্ করে। তুমি তো বাপু ইচ্ছে করলেই ওখান থেকে টুকটুকে একটা বৌ বিয়ে করে আনতে পার; তুমি যে-রকম বিদঘুটে দেখতে, তাতে আবার তোমার ভাগ্যও খুলে যেতে পারে।"

গুড়ুম! এ্যাঁ, এ কী হল? বন্দুকের শব্দ! আর, আহা রে, বাচ্চা বালিহাঁস দুটো ছটফট করতে করতে মরে গেল কলমিদামের মধ্যে! আবার ঐ—গুড়ুম! বুনো হাঁসের ঝাঁক উড়ল শ্যাওলা, কচুরিপানা আর দামের ভিতর থেকে। চারদিকে দারুণ একটা হৈ চৈ বেঁধে গেল, বন্দুকের আওয়াজ হচ্ছে ক্রমাগত।

শিকার করতে এসেছে কারা। বেশ বড়োসড়ো শিকারি দল। ঝোপে-ঝাড়ে বিভিন্নজন লুকিয়ে আছে। কেউ কেউ আবার গাছের উপরে উঠেছে, সে-সব গাছের শাখাপ্রশাখা আবার বিলের উপর ঝুলে আছে। শিকারি কুকুরগুলো কাদা, পানি সমানে ছিটোচ্ছে; পানিতে ডুবে-থাকা আগাছা, শ্যাওলা, দাম সরিয়ে সব দিক খুঁজছে। ওহ্, কী ভয়টাই না পেয়েছে বেচারি পোনা প্যাঁকারু! ছোট্ট মাথাটা কোথায় যে রাখবে সে ভেবেই পাচ্ছে না। শেষকালে মাথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে ডানার তলায় গুঁজে দিল, আর ঠিক তখনই এক বাঘা কুকুর—জিভ এ্যাত্তোখানি মুখ থেকে ঝুলছে, গোল গোল চোখ যেন আগুনের ভাঁটা—ধোঁৎ করে তার পাশ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। বিরাট চোয়াল, হাঁ করে আছে—যেন এক্ষুনি গিলে খাবে; কুকুরটা নাক কুঁচকে প্যাঁকারুর গা শুঁকল, ফর্সা তীক্ষ্ণ দাঁত খিঁচিয়ে উঠল, কিন্তু তারপর কী ভেবে ছপাৎ ছপাৎ করে জল ছিটিয়ে চলে গেল, কিচ্ছুটি করল না, গায়ে একটু আঁচড়ও দিল না তার, একেবারে ভালোমানুষটির মতো চলে গেল।

"উঃ, বাব্বাঃ, বাঁচলাম। করুণাময়ের অশেষ কৃপা।" সে মনে মনে ধন্যবাদ জানায় বিধাতাকে, "আমি দেখতে এতই জঘন্য যে কুকুরটা আমাকে কামড়াল না পর্যন্ত।"

এরপর প্যাঁকারু ঠিক ঐ জায়গাতেই তেমনি নিথর হয়ে শাপলার দামে মুখ গুঁজে পড়ে রইল। ওদিকে তখনো শিকারিদের হৈ-হল্লা পূর্বের মতোই উদ্দাম। বেলা গড়িয়ে বিকেল হয়ে এলে ওদের হট্টগোল হৈ চৈ কমল, কিন্তু তখনো বেচারা ভয়ে টুঁ শব্দ করল না একটুও। আরো ঘণ্টা কয়েক অপেক্ষা করার পর সে ঘাড় তুলে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখল চারদিক, আর তারপরে সেখান থেকে যত তাড়াতাড়ি পারে দৌড়। দৌড়, দৌড়, দৌড়। মাঠ পেরিয়ে, জমি পেরিয়ে, খানাখন্দ পার হয়ে সে দৌড়ুচ্ছে; বাতাসের বেগ খুব—দমকা হাওয়া বইছে শোঁ শোঁ, যেতে কষ্ট হচ্ছে তার, তবু সে দৌড়ুচ্ছে।

সন্ধে হয়ে এল প্রায়। তখনো ছুটছে প্যাঁকারু। দম নিতে যেই একটু থেমেছে, সামনে দ্যাখে একটা কুঁড়েঘর। একেবারে ভাঙাচোরা, শরীরে তার কিচ্ছু নেই, কোন্ দিকে হেলে ভেঙে পড়বে ঠিক করতে না পেরেই যেন দাঁড়িয়ে আছে এখনো। সে দেখল, একটা কবজা ভেঙে যাওয়ায় দরজার পাল্লাটা হুমড়ি খেয়ে পড়ছে দেয়ালে; যে অল্প একটু ফাঁক ছিল দেয়াল আর দরজার মধ্যিখানে সেখানে দিয়ে কোনো রকমে চেষ্টাচরিত্র করলে ভিতরে ঢুকতে পারে প্যাঁকারু। বাইরে হাওয়ার গর্জন বাড়ছে ক্রমশ। কী করবে এখন সে? ভয়ে ভয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল পোনা প্যাঁকারু।

www.pathagar.com

ঘরের মধ্যে এক বুড়ি বাস করত। আর ছিল তার পোষা বিড়াল টম, আর একটা মুরগি। পৃথিবীতে কেউ ছিল না বুড়ির, তাই বিড়ালটাকে সে ছেলে জ্ঞান করত। আর টম পুষি বুড়ির আদরে-আদরে লাই পেয়ে কেবলই পিঠ ফুলিয়ে লোম খাড়া করে গর্‌র্‌ গর্‌র্‌ করে বাড়িময় ঘুরে বেড়াত। তার লোম ধরে বেয়াড়া ধরনের ঠাট্টা করলে সে নখ দিয়ে আঁচড়ে দিতেও চেষ্টা করত। মুরগিটার পা দুটো আবার বড়োই ছোট্ট, বুড়ি সেজন্যে তাকে 'ঠুটো তিতি' বলে ডাকে। খুব সুন্দর ডিম পাড়ে 'ঠুটো তিতি', তাই বুড়ি একেও তার মেয়ের মতো মনে করত।

পরদিন সকালে তারা প্যাঁকারুকে দেখতে পেল। টম পুষি মিউ মিউ করে নতুন অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাল আর 'ঠুটো তিতি' কঁক্‌ কঁক্‌ করে ডেকে উঠল।

"ব্যাপার কী?" বুড়ি এদিক-ওদিক তাকিয়ে বিড়বিড় করে ওঠে। তার চোখ খারাপ হওয়ায় পোনা প্যাঁকারুকে সে ভালো করে দেখতে পেল না। তার মনে হল, একটা মোটা ধাড়ি হাঁস পথ ভুলে এখানে চলে এসেছে। বুড়ি তো খুব খুশি ; "বাহ্‌, ভালো জিনিস বাগানো গেছে," সে বলে ওঠে আনন্দে, "আমি এখন হাঁসের ডিম পাব রোজ। কী মজা! অবশ্য এটা যদি হাঁসা না হয়। দেখা যাক কী দাঁড়ায় শেষ তক্‌।" অতঃপর বুড়ি তিন সপ্তাহ ধরে রেখে দিল পোনা প্যাঁকারুকে। কিন্তু হায়, একটা ডিমও তো সে পাড়ল না।

এখন বিড়াল হল বাড়ির কর্তা আর ঠুটো তিতি বাড়ির গিন্নি। কথা বলতে গেলেই তারা বলত 'আমরা আর এই দুনিয়া' ; তারা মনে করত, দুনিয়ায় তারাই একমাত্র লোক, আর কেউ গণনার মধ্যেই নয়। প্যাঁকারু অবশ্য ভাবত যে, অন্য কোনো মতও তো থাকতে পারে এ ছাড়া, কিন্তু তার মতামত শ্রীমতী তিতি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনত না।

সে জিজ্ঞেস করত প্যাঁকারুকে, "তুমি কি ডিম পাড়তে পার?"

"উহু।"

"তাহলে চুপ মেরে থাক, বক্‌ বক্‌ কর না।"

আর টম পুষি বলত, "এইভাবে পিঠ ফোলাতে পার? এরকম গর্‌র্‌ গর্‌র্‌ করতে পার আমার মতন?"

"না।"

"ব্যস্‌, তাহলে আবার অতো কথা কী? বুঝদার লোকেরা যেখানে কথা বলে সেখানে তোমার কথা কওয়াই উচিত নয়।"

তখন কী আর করে প্যাঁকারু? ঘরের এক কোণে মনমরা হয়ে বসে থাকে। খোলা দরজা দিয়ে মুক্ত বাতাস আর সূর্যের আলো এসে পড়ছে ঘরের ভিতর। এসব দেখে তার আরো খারাপ লাগে, বাইরে ঘুরে আসতে ইচ্ছে যায়, সাঁতার কাটতে বাসনা হয়। শেষ পর্যন্ত আর থাকতে না পেরে ঠুটো তিতিকে মনের কথাটা খুলেই বলল সে।

"তোমার অসুবিধেটা কী হে বাপু?" শুনে তো তেড়ে এল মুরগি, "কাজকাম নেই তো, তাই এরকম নানান রঙিন স্বপ্ন দেখছ। ঠিক আছে, শোনো, একটা কাজ করো—তুমি ডিম পাড়তে চেষ্টা করো দেখি। না হয় গর্‌র্‌ গর্‌র্‌ করতে পার কিনা দ্যাখো,—তাহলেই এসব কুচিন্তা বেমালুম ভুলে যাবে। বুঝেছ?"

শুনে মন আরো খারাপ হয়ে গেল তার। আমতা-আমতা করে বলল, "কিন্তু, বুঝলে কিনা দিদি, সাঁতার কাটতে যে কী আনন্দ। কী আনন্দ—ঝপ্‌পাৎ করে ঝাঁপ দিয়ে পড়ব পানির বুকে, উপর দিয়ে পানি ঢেউ খেলাবে আর একেবারে পানির তলায় পাতালে চলে যাব সাঁতার কাটতে কাটতে. . ."

www.pathagar.com

"যত্তো সব বিদঘুটে সখ", তিতি ব্যাজার মুখে জবাব দিল, "মনে হচ্ছে, মাথায় তোমার কিঞ্চিৎ ছিট আছে হে বাপু। আমার কথা না-হয় বাদই দিচ্ছি, এই পুষির কথাই ধর না কেন—আমার জানাশোনার মধ্যে এত বড়ো জ্ঞানী তো আর কেউ নেই; তা জিজ্ঞেস করো দেখি পুষিকে যে তার সাঁতরাতে ইচ্ছে যায়, না ডুবসাঁতার দিয়ে একেবারে পানির তলায় পাতালে যেতে মন যায়, জিজ্ঞেস করো। আর তা না হলে—বুড়ি মা-কেই শুধোও না, তার চেয়ে তো আর কেউ বেশি চালাক নয়। তুমি কি ভাব তিনি সাঁতার কাটতে কি ডুবসাঁতারে ডুব মেরে থাকতে পছন্দ করবেন?"

"তোমরা বুঝতেই পারছ না ছাই আমি কী বলতে চাইছি", অগত্যা প্যাঁকারু না বলে আর পারল না।

"কী? কী বললে হে? আমরা তোমাকে বুঝতে পারছি না? বটে! তার মানে—তুমি তাহলে টম পুষির চেয়ে, বুড়ি মার চেয়ে, আমার কথা না-হয় বাদই দিলাম, এদের চেয়ে বেশি পণ্ডিত ভাব নিজেকে! বাছা, এত আহ্লাদ ভালো নয়। তোমাকে যথেষ্ট দয়া দেখানো হয়েছে, তাতেই সন্তুষ্ট থাকো, বুঝলে হে! একটা সুন্দর গরম ঘর দেয়া হয়েছে তোমাকে থাকবার জন্যে, তা ছাড়া এ-রকম মহৎ পরিবেশে কত কী শিখতে পাচ্ছ তুমি, তা খেয়াল আছে? নাঃ তুমি বড্ডো বক্‌বক্ করো, তোমার কচ্‌কচানি শুনতে শুনতে কানে তালা লেগে যায়। বিশ্বাস করো, আমি তোমার ভালোই চাই। হ্যাঁ, আমি তোমাকে প্রায়ই অপ্রিয় সত্যিকথা বলি বটে, কিন্তু সেটাকেই কি লোকে খাঁটি বন্ধুর লক্ষণ বলে না? যাক্ গে, এখন এসো তো বাপু, একটু চেষ্টা করে দ্যাখো যদি একটা ডিম পাড়তে পার আমার মতো; আর তা না পারলে, পুষির মতো একটু গর্‌র্ গর্‌র্ করো তো দেখি।"

"আমার মনে হচ্ছে, বাইরেটা কিছুক্ষণের জন্যে ঘুরে আসা দরকার, নয় কি? দিদি, দুনিয়ার হালচাল যদি একটু দেখতে পেতাম তবে বড়ো ভালো লাগত আমার", আর একবার বেহায়ার মতো চেষ্টা করল প্যাঁকারু।

"ধুত্তোর, ইচ্ছে হলে যাও গে। আমি কিছু জানি না"—বলে তিতি চলে গেল।

তখন পোনা প্যাঁকারু আবার বেরুল। দিঘি পেতে তার কষ্ট হয়নি। পানির উপরে বহুক্ষণ ধরে সাঁতার কাটল সে, ডুব দিয়ে পৌঁছে গেল একেবারে দিঘির তলদেশে। পাশ দিয়ে কত জীবজন্তু চলে গেল, কিন্তু কেউই একবার চোখ ফিরিয়ে তাকে দেখল না, এতই কদাকার সে।

হেমন্তকাল এসে গেল। গাছের পাতা হলদে হয়ে যাচ্ছে, শুকিয়ে লালচে হয়ে যাচ্ছে। বাতাস বইতে শুরু করেছে, গাছের পাতা উড়িয়ে নিয়ে নাচতে নাচতে যাচ্ছে সে। বাতাস হিম; আকাশে জমাট মেঘ বরফ আর শিলাবৃষ্টি সিসের মতো ভারি হয়ে আছে। একটা ঝোপের মাথায় একটা দাঁড়কাক বসে আছে, থেকে থেকে ডাকছে অশুভ কা-কা রবে। সব কিছু মিলিয়ে প্যাঁকারুর কেমন যেন ঠিক সুবিধের মনে হচ্ছে না।

২

সেদিন সন্ধ্যাবেলা। সূর্য মাত্র পাটে বসেছে। ছোটো নিচু একটা ব্রাশউড ঝোপ থেকে এক ঝাঁক পাখি উড়ল। প্যাঁকারু তো অবাক! এত অপরূপ পাখি সে জীবনে কোনো দিন দ্যাখে নি : তাদের ডানার পালক সব সাদা, তাদের ঘাড় চিকন-সরু আর দীর্ঘ। তারা মরাল। মুখ থেকে কেবল সামান্য একটু শব্দ বেরুল তাদের ; তারপর লম্বা, বিরাট, অপূর্ব ডানা মেলে ধরল তারা আকাশে, বাতাস কেটে কেটে উড়ে চলল সমুদ্র পার হয়ে, ঠাণ্ডা হিম ভূখণ্ড

www.pathagar.com

পেরিয়ে উষ্ণ কোনো দেশে। আকাশে উড়ছে তারা, উঁচুতে, আরো উঁচুতে। প্যাকারুর মনে নানারকম অদ্ভুত অনুভূতি জাগতে লাগল এদের দেখে। ওদের দেখবার জন্য সে পানির উপরে ঘুরপাক খেয়ে ঘাড় উঁচু করে তুলে ধরছিল; তার মুখ দিয়ে অজান্তেই অকস্মাৎ এক তীক্ষ্ণ অদ্ভুত শব্দ বেরিয়ে এল;—সে নিজেই ভয় পেয়ে চমকে উঠল নিজের কণ্ঠস্বরে। আহ, সে তো সারা জীবন এদের ভুলতে পারবে না—কী অপরূপ পাখি, কী সুখী বিহঙ্গ! তার জানা নেই এদের নাম কী, সে জানে না তাদের গন্তব্যস্থল। তবু সে ভালোবেসে ফেললো ওদের, এত ভালো আর কাউকে সে কখনো বাসেনি। তার মোটেই হিংসে হয়নি ওদের দেখে। একবারও তার মনে হয়নি যে, ও-রকম রূপ যদি তারও থাকত। হাঁসপাখির পাতিহাঁসগুলো তাকে সঙ্গী করে নিলেই সে তৃপ্ত থাকতে পারে, মনে হল তার।

শীত এসে গেছে। কী দারুণ ঠাণ্ডা! পাছে হিমে জমে যায় তাই প্যাকারু পানিতে কেবলই সাঁতার কাটে। কিন্তু দিন-কে-দিন সাঁতারের স্থান যে তার সঙ্কুচিত হয়ে আসছে; রাত পোহালেই রোজ সে দেখতে পায় যে, গতকাল যে-পানিটুকুতে সে সাঁতার কেটেছিল তার কিছুটা জমে বরফ হয়ে গেছে। শেষকালে তার সাঁতরাবার কোনো জায়গাই যখন আর রইল না, তখন যেটুকু স্থান তখনো বরফে জমে যায়নি সেখানেই সে অবিরাম পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে সাঁতার কাটতে লাগল যাতে ঐ জায়গাটুকু অন্তত জমে না যেতে পারে। কিন্তু এর ফলে শিগ্‌গিরই সে খুব অবসন্ন ও ক্লান্ত হয়ে নেতিয়ে পড়ল; অবশেষে এক সময়ে ওখানেই সে হিমে সিঁটিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে রইল।

তখন সকাল হয়েছে সবেমাত্র। এক চাষি দিঘির পাড় দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। সে দেখল, একটা পোনা হাঁস বরফের মধ্যে আটকা পড়ে জমে আছে। তার পায়ে ছিল কাঠের খড়ম, তা দিয়ে সে পিটিয়ে পিটিয়ে বরফের চ্যাঙড় ভেঙে টেনে তুলল প্যাকারুকে, তারপর বাড়ি নিয়ে গিয়ে তার বৌয়ের হাতে তুলে দিল।

শেষ পর্যন্ত বেঁচে উঠল প্যাকারু। বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তার সাথে খেলা করতে পছন্দ করত, কিন্তু সে ভাবত যে ওরা তাকে নাজেহাল করতে চায়। ভয় পেয়ে সে দুধের গামলার উপর হুড়মুড় করে গিয়ে পড়ত, আর দুধ ছিটকে ঘরময় হয়ে যেত। বাড়ির গিন্নি বেশ ভালোমানুষ ছিল বলতে হবে—সে চেঁচিয়ে উঠত, হাততালি দিত। তখন সে ছুটে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ত ননীর গামলায়, সেখান থেকে বেরিয়ে ক্ষুদকুঁড়োভর্তি পিপেয়, তারপর সেখানে থেকে বেরিয়ে দে ছুট্।

মহিলাটি চেঁচামেচি করে ছড়িটড়ি কিছু একটা ছুঁড়ত তার দিকে। বাচ্চারা হৈ চৈ করে তাকে ধরার জন্যে দৌড়-ঝাঁপ লাগাত, আনন্দে হেসে কুটিকুটি হত আর চেঁচাত। ভাগ্য তার ভালো বলতে হবে—সদর দরজা খোলা থাকত সাধারণত। সে একছুটে গিয়ে ঢুকত ঝোপঝাড়ে—নতুন বরফ পড়ে সেটা তখন একেবারে ঢেকে গেছে; সেখানেই সে গিয়ে শুয়ে থাকত যেন কোন স্বপ্নের ঘোরে।

সেই শীতে তাকে যে-সব জ্বালাযন্ত্রণা আর কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল তার লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে কোনো লাভ নেই। আবার যখন সূর্যের তেজ দেখা দিল, গরম পড়তে আরম্ভ করল, সে তখন বনে-বাদাড়ে ঝোপ-ঝাড়ে গিয়ে শুয়ে থাকত। লার্ক পাখি গান গাইতে শুরু করেছে ততদিনে, বসন্ত এসে গেল ফের পৃথিবীতে।

ডানা দুটো সে বেশ ভালো করে ঝেড়ে নিল। আগের চেয়ে বেশ জোরদার হয়েছে, মনে হল তার; এর ফলে আরো দ্রুততর ভাবে সে এখন যেতে পারে। সে বেশ বুঝতে পারল

www.pathagar.com

যে, এখন সে একটা বিশাল বাগানের মধ্যে আছে। সেখানে আপেল গাছ ফুলে ফুলে একাকার, সিরিংগা ফুলের গন্ধে চারদিক ম-ম করছে, আঁকাবাঁকা খালের উপরে তারা তাদের সবুজ ডালপালা ছড়িয়ে দিয়েছে। আহ্, সব কিছু এত সুন্দর, বসন্তের টাটকা সৌরভে ভরে আছে সব।

একটা ঝোপের আড়াল থেকে তিনটি চমৎকার রাজহাঁস বেরিয়ে এল। ডানার পালকগুলো গর্বভরে কী সুন্দর ছড়িয়ে দিল তারা ; হালকা—যেন হাওয়ায় ভেসে তারা সাঁতার কাটতে লাগল ঝিলের জলে। এই অপরূপ পাখিটিকে যে চেনে প্যাকারু; কী এক অচেনা বিষণ্ণতায় তার মন ভরে গেল।

"ওদের কাছে বরং একটু উড়ে গিয়ে বসি। আহা, রাজপক্ষী আর বলে কাকে!" সে ভাবে। "অবশ্য ওরা আমাকে মেরেই ফেলবে, এমন বিদঘুটে চেহারা নিয়ে যে ওদের কাছে যাবার দুঃসাহস করেছি, তাই। কিন্তু তাতে কী? পাতিহাঁসদের এরকম মারধর, মুরগিদের ঠোকর, খামারবাড়ির মেয়েটার হাতে সদাসর্বদা লাথি-ঝাঁটা খাওয়ার চাইতে বরং ওদের হাতে মরাও ঢের ভালো; আর উঃ, এই শীতকালটায় কী কষ্টটাই-না পেলাম।" সে উড়ে গিয়ে বসল জলের বুকে, সাঁতার কেটে ঐ অনিন্দ্যসুন্দর পাখিগুলোর কাছে চলে গেল। তারাও ততক্ষণে তাকে দেখতে পেয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। "আমাকে আপনারা মেরে ফেলুন", বেচারা প্যাকারু বলে উঠল, মৃত্যুর অপেক্ষায় মাথাটা নিচু করল। আর তখনি—আরে, এ সে কী দেখছে জলের বুকে? পানিতে সে তার নিজের চেহারা দেখতে পেল : এতো কোনো হোঁৎকা বিচ্ছিরি পাঁশটে প্যাকারু নয়, এ যে এক রাজহংসের ছবি।

আসল কথা—রাজহাঁসের বংশ যদি কারো হয়, তো সে পাতিহাঁসপট্টিতে জন্মালেও কিছু এসে যায় না।

বড়ো বড়ো রাজহাঁসগুলো তার চারপাশে এসে ঘিরে ধরল তাকে, ঠোঁট দিয়ে ছুঁয়ে তাকে স্বাগত জানাল। নিজেকে খুব সুখী মনে হচ্ছিল তার।

ছোট ছোট কিছু ছেলেমেয়ে বাগানে দৌড়াদৌড়ি করে খেলা করছিল। তারা পানির বুকে ক্ষুদ আর রুটির টুকরো ছুঁড়ে দিতে লাগল। ওদের মধ্যে যে সবচেয়ে ছোট, সে অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠল : "আরে, এ যে একটা নতুন দেখছি।" অন্যেরাও চেঁচিয়ে উঠল, "তাই তো, একটা নতুন রাজহাঁস এসেছে!" আনন্দে হাততালি দিতে দিতে দৌড়ে গেল তারা বাবা-মার কাছে খবর দিতে। রুটি আর কেকের টুকরো সবাই ছুঁড়ে ফেলতে লাগল জলে, বলাবলি করল : "নতুনটাই সবচেয়ে সুন্দর, একেবারে কচি বয়েস, আর কী সুন্দর!" আর পুরনো রাজহাঁসগুলো তাকে মাথা নুইয়ে সম্ভ্রম জানাল। এতে বড়ো লজ্জা লাগল তার, ডানার মধ্যে মাথা গুঁজল সে। মন তার সুখে ভরে গেছে আজ; অথচ এতটুকুও অহংকার হল না তার—যার মন ভালো সে তো কখনো অহংকারী হয় না।

তার সব মনে পড়তে লাগল—সবাই তার দিকে চেয়ে কী রকম হাসি-তামাশা করেছে, নির্দয় ব্যবহার করেছে তার সাথে, সব। আর এখন সে শুনছে যে সবাই বলছে, সে-ই না কি সমস্ত সুন্দর পাখিদের মধ্যেও সবচেয়ে সুন্দর। সিরিংগা তার ফুল্ল শাখাপ্রশাখা নুইয়ে দিল তার দিকে, সূর্য হয়ে উঠল মধুরতর, উষ্ণতাময় ও আলোকোজ্জ্বল। আর সে তার ডানা দুটো একটু ঠিকঠাক করে ঝেড়ে নিল, বাড়িয়ে দিল তার সুদীর্ঘ পেলব গ্রীবা, আর প্রাণের আনন্দে বলে উঠল : "যখন আমি ছিলাম সকলের চক্ষুশুল কুচ্ছিৎ প্যাকারু, তখন তো কখনো এত সখের কল্পনাও আমি করিনি।"

www.pathagar.com

রাজার নতুন পোশাক

এক ছিল রাজা, তাঁর ছিল বেজায় জামা-কাপড়ের শখ। কোনো রাজার শখ থাকে হাতি-ঘোড়া, সৈন্য-সামন্ত নিয়ে যুদ্ধ খেলা; কোনো রাজার শখ থাকে সোনা-বসানো খাটে শুয়ে গুণীদের গান শোনা—কিন্তু এই যে আমাদের রাজা, তাঁর শখ ছিল সাজ-গোজের, ছবির মতো সাজতে পারলেই তিনি খুশি। অত যে তাঁর ঐশ্বর্য, তা খরচ হত কেবল জামা-কাপড় কিনে। ঘণ্টায়-ঘণ্টায় নতুন পোশাক চাই তাঁর, সেজে গুজে, গাড়ি চড়ে একবার ঘুরে আসতে পারলে আর-কিছুই তিনি চাইতেন না। লোকে যেমন বলে, 'রাজা বসেছেন তাঁর সভায়,' তাঁর সম্বন্ধে সবাই বলত, 'রাজা আছেন তাঁর সাজ-ঘরে।'

মস্ত শহরে তিনি থাকেন, দিন-রাত সেখানে ফুর্তি আর তামাশা। রোজ লোক আসে দেশ-বিদেশ থেকে। একদিন এল দুজন জোচ্চোর; এসেও বলে বেড়াল তারা তাঁতি, এমন মিহি সুতোর কাপড় তারা বুনতে পারে যা কেউ ভাবতেও পারে না। আশ্চর্য তার রং, আশ্চর্য বুনোন। আর সবচেয়ে আশ্চর্য একটা গুণ সে-কাপড়ের—যদি কেউ হয় নিরেট বোকা, কি তার কাজের অযোগ্য, তাহলে তো সে চোখেই দেখতে পাবে না!

'চমৎকার, চমৎকার!' রাজা মনে-মনে ভাবলেন। 'ও-কাপড় যদি আমি পরি, তাহলে বুঝতে পারব আমার রাজত্বে কে-কে আছে অযোগ্য, আর কোনগুলো নিরেট বোকা। কী মজাই হবে তখন! এই কাপড়ই আমার চাই—এক মুহূর্ত দেরি না হয়।'

এই ভেবে তিনি জোচ্চোরদের অনেকগুলো টাকা আগাম দিয়ে দিলেন—এক্ষুনি কাজ আরম্ভ হোক। তারা খাটাল মস্ত দুটো তাঁত, আর এমন ভাব দেখাল যেন সারাদিন সেখানে কাজ করছে। আসলে কিন্তু তাদের তাঁতে মোটেই সুতোর বালাই নেই। তারা চেয়ে নিলে সাত কাহন সোনা আর সাত বস্তা সবচেয়ে দামি রেশম—নিয়ে সেগুলো আত্মসাৎ করলে। তারপর শূন্য তাঁতে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজ করবার ভান করতে লাগল।

www.pathagar.com

রাজা ভাবলেন, 'দেখে আসি ওদের কাজ কতদূর এগোল।' কিন্তু যেই তাঁর মনে পড়ল অযোগ্যরা সে-কাপড় চোখে দেখতে পাবে না, কেমন একটু অস্বস্তি লাগল তাঁর। নিজের সম্বন্ধে তাঁর ভয় আছে এ-কথা অবিশ্যি তাঁর মনে হল না। তবু, আর-কেউ আগে গিয়ে একবার দেখে আসুক-না ব্যাপারখানা কী। রাজ্যের সবাই সে কাপড়ের আশ্চর্য গুণের কথা জেনে গেছে; সবাই ভাবছে—এবার দেখা যাবে অমুক লোক কী ভীষণ বোকা।

রাজা ভাবলেন, 'আমার বুড়ো মন্ত্রীকেই আগে পাঠাব। তিনি তো খুব বুদ্ধিমান শুনি, আর তাঁর কাজ তাঁর চেয়ে ভালো কেউ বোঝে না। তিনিই ঠিক বুঝবেন, কাপড়টা কেমন হচ্ছে।'

বুড়ো মন্ত্রী গেলেন সেই প্রকাণ্ড বাড়িতে, যেখানে দুই জোচ্চোর বসে-বসে শূন্য তাঁতে কেবলি ঠোকাঠুকি করছে।

'কী কাণ্ড!' বুড়ো মন্ত্রী নিঃশ্বাস ফেলে চোখ বড়ো করে তাকালেন, 'আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছিনে!' কিন্তু মুখে তিনি সে-কথা প্রকাশ করলেন না।

দুই জোচ্চোর সবিনয়ে তাঁকে কাছে আসতে বলল। 'দেখুন, রং গুলো কি ভালো নয়? বুনোন কি ঠিক হচ্ছে না?' খালি তাঁততার দিকে বার বার আঙুল দিয়ে দেখাতে লাগল, আর বুড়ো মন্ত্রীর চোখ কেবলি বড়ো হতে লাগল। কিন্তু কিছুই তিনি দেখতে পেলেন না, কেননা দেখবার কিছুই ছিল না তো ওখানে।

'রামচন্দ্র! সত্যি কি আমি এতই বোকা? আমি তো কখনো তা ভাবিনি, লোকেও তা মনে করে না! কী উপায় হবে, লোকে জানলে! আমি মন্ত্রী হবার অযোগ্য? তাই তো, তাই তো!'

এই ভেবে বুড়ো মন্ত্রী তাঁর চশমার ফাঁক দিয়ে মিটমিট করে তাকিয়ে বললেন,

'তোমাদের কাজ খুব ভালো হয়েছে, আমি মহারাজকে এ-কথাই বলব যে আমি দেখে খুব খুশি হয়েছি। চমৎকার রং, আর কী অদ্ভুত কারুকার্য!

'বেশ কথা, সে তো বেশ কথা,' জোচ্চোরেরা বলল। তারপর তারা গম্ভীরমুখে রং গুলোর নাম বলল, বিচিত্র নক্‌শাটা বুঝিয়ে দিলে ভালো করে। মন্ত্রী মন দিয়ে সব শুনলেন, তারপর রাজার কাছে গিয়ে সেই কথাগুলোই আউড়ে গেলেন।

এদিকে জোচ্চোরেরা আরো টাকা নিল, নিল আরো সোনা, আরো রেশম। বলল কাপড় বুনতে ও-সব লাগবে। সব তারা থলিতে ভরে রাখলে, এতটুকু সূতোও তাঁতে উঠল না। কিন্তু সেই তাঁতের সামনে বসে তারা একটানা কাজ করে যেতে লাগল।

কয়েকদিন পর রাজা তাঁর একজন খুব বিচক্ষণ পারিষদকে কাপড় দেখতে পাঠালেন। মন্ত্রী যা দেখেছিলেন, ইনিও তা-ই দেখলেন। তাকাতে-তাকাতে তাঁর চোখ ব্যথা হয়ে গেল যেহেতু খালি তাঁত ছাড়া আর কিছু নেই, খালি তাঁত ছাড়া আর কিছু তিনি দেখতে পেলেন না।

'সুন্দর হচ্ছে না জিনিসটা? কী বলেন?' বলে জোচ্চোরেরা নানাদিক থেকে কাল্পনিক কাপড়টা দেখাল, কাল্পনিক নক্‌শাগুলোর ছাঁদ বুঝিয়ে দিলে ভালো করে।

পারিষদ ভাবলেন, 'আমি তো বোকা নই! তবে কি রাজপারিষদ হবার অযোগ্য? কিন্তু এ-কথা তো কেউ কখনো বলেনি। যাই হোক, এদের টের পেতে দিলে চলবে না।' এই ভেবে তিনি সেই অদৃশ্য বস্ত্রের খুব প্রশংসা করলেন, 'সুন্দর রং, সুন্দর নক্‌শা!' তারপর রাজার কাছে গিয়ে বললেন, মহারাজ, যা কাপড় হচ্ছে আপনার, এমনটি আর কখনো কেউ দেখেনি।'

এতদিন শহরের লোকের মুখে আর কোনো কথা নেই। না জানি কী আশ্চর্য কাপড় বোনা হচ্ছে রাজার জন্যে—এমন আর কি কেউ কোনোদিন দেখেছে? রাজার খেয়াল হল নিজে

www.pathagar.com

গিয়ে একবার ব্যাপারটা দেখে আসবেন। সারা পড়ে গেল শহরে। সঙ্গে গেল তাঁর একদল বাছাই-করা লোক—তার মধ্যে আছেন সেই বুড়ো মন্ত্রী, আছেন সেই বিচক্ষণ পারিষদ। পুরোদমে জোচ্চোররা তখন বুনছে, প্রাণপণে বুনছে—তার না আছে টানা, না আছে পোড়েন।

'কী, সুন্দর! না?' বুড়ো মন্ত্রীমশাই আর সেই বিচক্ষণ পারিষদ প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলেন। 'মহারাজ, নক্‌শাটা একবার দেখুন! আর রঙেরই-বা কী বাহার!' উৎসাহের ঝোঁকে খালি তাঁতটা বার-বার তাঁরা আঙুল দিয়ে দেখাতে লাগলেন—কেননা তাঁরা তো জানেন অন্য সবাই দেখতে পাচ্ছে চমৎকার!

রাজা মনে মনে চমকে উঠলেন। 'কী সর্বনাশ! আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছিনে! কী সর্বনাশ! বোকা নাকি আমি? না কি রাজা হবার অযোগ্য? এর চেয়ে সর্বনাশ আর কী হতে পারে আমার।' তারপর সবাইকে শুনিয়ে ভারিক্কি চালে বললেন, 'খুবই সুন্দর হয়েছে। আমরা সানন্দে এর প্রশংসা করছি।' মৃদুভাবে মাথা নেড়ে গম্ভীরভাবে তিনি শূন্য তাঁতের দিকে তাকালেন—হায়রে। এ-কথা বলবার তাঁর উপায় নেই যে কিছুই তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। সঙ্গে দলবল যারা ছিল তারা চোখ বড়ো করে বার বার তাকাল, কিন্তু অন্যদের চাইতে বেশি দেখতে পেল না তারা। তবু সমস্বরে তারা রাজার কথারই প্রতিধ্বনি করে উঠল, 'খুব সুন্দর তো!' 'কী সুন্দর'! 'কী আশ্চর্য'! 'কী চমৎকার!' এ-সব ছাড়া কারো মুখে অন্য কথা নেই। চারদিকে ফূর্তির বান ডাকল যেন; সবাই বলল, 'সামনের মাসে রাজপ্রাসাদ থেকে যে-মস্ত মিছিল বেরোবে তাতে মহারাজ এই পোশাকটিই যেন পড়েন।' রাজা খুশি হয়ে জোচ্চোরদের উপাধি দিলেন, 'তন্তুবায় চন্দ্রকলা।'

কাল মিছিল বেরোবে। সন্ধে থেকে সারারাত ষোলোটা মোমবাতি জ্বালিয়ে জোচ্চোররা খেটেছে। শহরের লোক দেখছে আর বলাবলি করছে, 'সাবাশ বটে! কাল ভোরের আগে পোশাক এক্কেবারে তৈরি করে দেয়া তো চাই।' জোচ্চোররা এমন ভান করলে যেন তাঁত থেকে কাপড় নামাচ্ছে, প্রকাণ্ড কাঁচি দিয়ে বাতাসকে তারা ফালি করে ফাড়ল; সুতো-ছাড়া ছুঁচ দিয়ে তারা সেলাই করল; তারপর নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'পোশাক তৈরি।'

রাজা স্বয়ং এলেন তাঁর জমকালো ঘোড়সওয়ারের দল নিয়ে। জোচ্চোররা কুর্নিশ করে দাঁড়াল, তারপর এমনভাবে হাত তুলল যেন কিছু ধরে আছে 'এই তো ইজের; আর এইটি কুর্তা, এই চাপকান', এমনি তারা বলতে লাগল। 'মাকড়সার জালের মতো হাল্কা, পরলে মনে হবে না কিছু পরেছেন। কিন্তু সে-ই তো এ-কাপড়ের কেরামতি।'

'ঠিক কথা' বলল ঘোড়সওয়ারের দল। কিন্তু তারা কিছুই অবিশ্যি দেখতে পেল না, যেহেতু দেখবার কিছু তো ছিলই না।

জোচ্চোররা তখন বলল, মহারাজা, যদি দয়া করে বস্ত্রত্যাগ করেন, বড়ো আয়নার সামনে নতুন পোশাকটা পরিয়ে দেখিয়ে দিতে পারি।'

মহারাজ তো বস্ত্র ত্যাগ করলেন, আর তারা এক-এক করে নতুন পোশাকের বিভিন্ন অংশ তাকে পরিয়ে দেবার ভান করল; মহারাজ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘুরে-ফিরে দেখলেন।

বাঃ! কী চমৎকার দেখাচ্ছে!' জোচ্চোররা একসঙ্গে বলে উঠল, কী চমৎকার মানিয়েছে! মানিয়েছে! নক্‌শার কী কারুকার্য, রঙের কী বাহার! পোশাক হয়েছে বটে একখানা!'

মিছিলের মালেক এসে বললেন, 'মহারাজ, ছত্রধারীরা বাইরে অপেক্ষা করছে, মিছিল এখনই বেরোবে।'

www.pathagar.com

'আমি তো প্রস্তুত। দ্যাখো তো আমাকে ঠিক মানিয়েছে কিনা?'

বলে রাজা আবার আয়নার দিকে তাকালেন, তাঁর নতুন পোশাক বিশদভাবে অনেকক্ষণ ধরে দেখছেন এমন ভাব করলেন।

বান্দারা নিচু হয়ে মেঝেতে হাত রাখল, তারপর হাত মুঠো করে উঠে দাঁড়াল, যেন রাজার উড়ুনির লুটিয়ে-পড়া আঁচল ধরে রয়েছে। পাছে কেউ লক্ষ করে ফ্যালে যে তারা কিছুই দেখছে না এই ভয়ে তারা অস্থির।

এমনি করে রাজা বেরোলেন মিছিল করে, মাথার উপরে সোনারুপোর কাজকরা মণি-মুক্তোর ঝালর-বসানো রাজছত্র। রাস্তার দুদিকে যত লোক ভিড় করে দাঁড়িয়েছিলো সবাই বলাবলি করলে, 'তুলনা হয় না রাজার এই নতুন পোশাকের! কেমন মানিয়েছে একবার দ্যাখো!' উড়ুনির আঁচলখানাই-বা কী!' এ-কথা কেউ জানতে দিতে চায় না যে সে নিজে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, কেননা তাহলেই প্রমাণ হবে যে হয় সে নিরেট বোকা, নয়-তো তার কাজের অযোগ্য সে। এত বাহবা রাজার কোনো পোশাকই কখনো পায়নি।

শেষ পর্যন্ত ছোট্ট একটি ছেলে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'ওমা! রাজা দেখছি কিছুই পরেন নি।' রাজা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'শোনো একবার বোকা ছেলেটার কথা।'

কিন্তু কথাটা কানাঘুষোয় চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আস্তে-আস্তে সবাই বলতে আরম্ভ করল, 'আমাদের রাজা দেখি কিছুই পরেননি!'

ক্রমে কথাটা রাজার কানে কেমন ঠেকল। তাঁর মনে লাগল কথাটা, কেননা তাঁর যেন মনে হল যে কথাটা ঠিক। কিন্তু মনে মনে তিনি ভাবলেন, 'মিছিল করে বেরিয়েছি যখন, যেতেই হবে মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে।' আর বান্দারা আরো বেশি শক্ত করে মুঠি চেপে ধরল; আঁচলই নেই, অথচ আঁচল ধরে ধরে নিয়ে চলল তারা।

www.pathagar.com

নববর্ষে মৃত কিশোরী

সেদিন প্রচণ্ড শীত ছিল। খুব বরফ পড়ছে। চতুর্দিক যেন অন্ধকার গ্রাস করে নেবে। বছরের শেষ দিন; শেষ সন্ধ্যা নামছে পৃথিবীতে। এই দুরন্ত শীত ও আঁধারে সে ধীরে ধীরে পথ হেঁটে চলেছে—এক দরিদ্র কিশোরী। তার পা একেবারে খালি, মাথাতেও কোনো গরম কাপড় নেই; অথচ কী কনকনে ঠাণ্ডা বাইরে। বাড়ি থেকে যখন সে বেরিয়েছিল তখন অবশ্য তার পায়ে জুতো ছিল একজোড়া, কিন্তু তারা কোনোই কাজে এল না শেষ পর্যন্ত। চটিজোড়াটা ছিল তার মায়ের। রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়ার ভিড়ে পাশ কাটিয়ে দৌড়তে গিয়ে কোথায় যে ছিটকে পড়ল এক পাটি পা থেকে! অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সে পেল না। আর অন্য পাটি জুতো রাস্তার এক ছেলে ছিনিয়ে নিয়ে দৌড় দিয়েছে।

ছোট্ট মেয়েটি খালি পায়েই হাঁটছে, কী আর করবে! ঠাণ্ডাতে তার খালি পায়ে কালশিরে পড়ে গেছে। পরনে জরাজীর্ণ ক্লাপড়, তাতে কয়েক বান্ডিল দেশলাই বেঁধে নিয়েছে, তার হাতেও ধরা আছে আরো বেশ কিছু দেশলাই। পাহাড়ে সারা দিন কেটে গেল, একটি জনপ্রাণীও তার কাছ থেকে একটাও দেশলাই কিনল না; একজনও তাকে একটা ফুটো পয়সাও দিয়ে যায় নি। অসম্ভব ক্ষিধে আর শীতে কোনোরকমে নিজেকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল সে, দুঃখের জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি।

তার লম্বা সুন্দর কোঁকড়ানো চুল কাঁধের ওপর থমকে আছে, তুষারকণা লেগে রয়েছে তাতে। কিন্তু সে তো এখন তার দৈহিক রূপ সম্বন্ধে ভাবছে না, ঠাণ্ডা সম্পর্কেও না। রাস্তার দুপাশের বাড়িগুলোর জানলা দিয়ে আলো ঠিকরে এসে বাইরে পড়ছে। রাজহাঁস রোস্টের গন্ধ নাকে এসে ধাক্কা দিল। চারদিকে আজ উৎসবের ঢেউ, নববর্ষ এসে গেছে।

রাস্তার উপরে দুটো বাড়ি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। একটা অন্যটা থেকে বেশি লম্বা হওয়ায় দু'বাড়ির সংযোগস্থলে একটি সুন্দর কোণ হয়ে আছে।

সেই কোণের ঘুপচিতে বেচারি বসে পড়ল, ক্ষুদে ক্ষুদে পা দুটোকে টেনে নিয়ে গুটিশুটি মেরে বসল,—কিন্তু হায় রে, বৃথা চেষ্টা; পা দুটোকে গরম করা গেল না। অথচ বাড়িতে

www.pathagar.com

ফেরার সাহসও তার উবে গেছে—এখন পর্যন্ত সে একটি দেশলাইও বিক্রি করতে পারে নি, এক পয়সাও রোজগার হয়নি তার, ফলে তার বাবা আজ তাকে নির্ঘাৎ মারবে। তাছাড়া, তাদের বাড়ি তো এমন কিছু ভালো নয়, রাস্তার মতোই সেটা ঠাণ্ডা কনকনে। কেন না এক বিরাট বাড়ির ছাদের নিচে তাদের ভাঙাচোরা ছাপড়া—তার চালের মধ্যে অসংখ্য জায়গায় ফুটো; খুড়কুটো বা ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়ে যদিও সেগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে তবু হাড়-কাঁপানো হিম বাতাস তার ভিতর দিয়ে হিসহিস করে চলে আসে, দাপাদাপি করে সারা ঘরময়। ঈশ্, কী ঠাণ্ডা ! তার হাত জমে যাচ্ছে যেন। সাহস করে দেশলাই জ্বালালে তার আগুনে হয়তো সে হাত-পা সেঁকে নিতে পারে, গরম করতে পারে একটু। একটা কাঠি বের করল সে, দেশলাই বাক্সে ঘষতেই ফস করে জ্বলে উঠল। কী উজ্জ্বল আলো, কী সুন্দর, ছোট্ট মোমবাতি জ্বালালে যেমন অল্প গরম লাগে ঠিক তেমনি। মেয়েটি তার কিশোর-কচি আঙুল মেলে ধরল ঐ আগুনের ওপর। তার মনে হল, সে যেন খুব কারুকাজ-করা এক পিতলের স্টোভের সামনে বসে আছে; আর সে-স্টোভে কী চমৎকার আগুনের শোভা ! একটু উষ্ণতার জন্যে সে তার দুপা টান-টান করে ছড়িয়ে দিল। কিন্তু হায় ! এক মুহূর্তের মধ্যে নিভে গেল আগুনের শিখা, স্টোভও মিলিয়ে গেল কোথায়, আর সেই কিশোরী মেয়ে কনকনে হিমে কী কষ্টেই-না বসে থাকল চুপচাপ, তখনো হাতে ধরে আছে নিভে যাওয়া দেশলাই-কাঠি।

দ্বিতীয় একটা কাঠি নিয়ে আবার সে জ্বালাল। ফস করে পুনর্বার জ্বলে উঠে বড়ো মনোরম আলো দিতে লাগল তা। আর দেয়ালের যেখানে-যেখানে ঐ আলো পড়ল, কী অবাক কাণ্ড, দেয়াল কেমন স্বচ্ছ পাতলা হয়ে গেল মেয়েদের ওড়নার মতো। পাথরের দেয়াল যেন ফুরফুরে স্বচ্ছ ওড়না, তাই দেয়ালের ওদিকে ঘরের ভিতরটা এখনি অত্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে। সে দেখল—ঘরেতে লম্বা ডিনার টেবিল পাতা হয়েছে, তার উপরে বরফের মতো সাদা টেবিল ক্লথ আর তার উপর ঝকঝক করছে নৈশাহারের উপযুক্ত যাবতীয় দামি দামি বাসন-পত্র পেয়ালা চামচ ইত্যাদি। আপেল আর কিসমিস দিয়ে তৈরি হাঁসের রোস্ট রয়েছে টেবিলের এক প্রান্তে, গরম ধোঁয়া উঠছে তা থেকে। কিন্তু এর পরে যা হল সেটাই আনন্দের; সে দেখল—হাঁসটি, এখনো তার বুকে ছুরি-কাঁটাচামচ বিঁধে আছে, এক লাফে বাসন থেকে নেমে পড়ল মেঝেতে আর থুপথুপ করে হেলে দুলে তার কাছে চলে এল। আবার নিভে গেল দেশলাই-কাঠি, মেয়েটি অনুভব করল পুরু কঠিন ঠাণ্ডা দেয়াল তার পাশে।

তৃতীয় কাঠি আবার জ্বালাল সে। আগুন জ্বলে উঠল ফের। আর মনে হল, খুব সুন্দর এক ক্রিসমাস ট্রির নিচে সে বসে আছে; গতবারের ক্রিস্মাস সন্ধ্যায় এক সওদাগরের বাড়িতে যে একটা গাছ দেখেছিল কাচের জানলা দিয়ে, তার চেয়ে আরো বড়ো ও সুন্দরতর গাছ এটি। গাছের সবুজ ডালপালায় হাজার হাজার মোমবাতি জ্বলছে। ছোট্ট বামন মানুষেরা—অবিকল যেমন একটা দোকানে দেখেছিল—গাছ থেকে নিচে তার পানে তাকিয়ে আছে। কিশোরীটি হাত বাড়াল তাদের দিকে আর ঠিক তখনি নিভে গেল আলো। এবারে কিন্তু ক্রিস্মাস মোমবাতিগুলো নিভল না, জ্বলতেই লাগল, জ্বলতে জ্বলতে ক্রমেই উঁচুতে উঠে যেতে লাগল যতক্ষণ-না অনেক উঁচুতে আকাশের তারা হয়ে একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর হঠাৎ একটা খসে পড়ল তাদের মধ্য থেকে, আলোর পুচ্ছ পিছনে জ্বালাতে জ্বালাতে নিচের দিকে নেমে এল।

www.pathagar.com

মেয়েটি স্থির নেত্রে দেখল এ দৃশ্য। অস্ফুট মৃদু স্বরে বলে উঠল সে, "আহা! কে যে মারা যাচ্ছে এখন!" বুড়ি দাদির মুখে গল্প শুনেছিল, যখন কোনো তারা খসে পড়ে তখন কোনো মানবাত্মা স্বর্গ পানে উড়ে যায়। একমাত্র এই বৃদ্ধ পিতামহীই তাকে ভালোবাসতেন; এখন আর তিনি জীবিত নন। কিশোরী মেয়ে আবার একটা কাঠি জ্বালাল, আলো ছড়িয়ে পড়ল তার চারদিক ঘিরে। তখন দেখল কী সে? উজ্জ্বল আলোকে সে তখন দেখতে পেল তার আদরের দাদি-মা তেমনি প্রশান্ত স্নেহময়ী, কিন্তু জীবিতকালে কখনো সে তাঁকে এত সুখী আর আনন্দোজ্জ্বল দ্যাখেনি।

উত্তেজনায়, খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল সে, "দাদি, আমাকে তোমার সাথে নিয়ে চল। এই দেশলাই-কাঠি নিভে গেলে তুমি আমাকে ফেলে চলে যাবে, আমি জানি। পিতলের গরম স্টোভ, নববর্ষের আনন্দভোজ আর ঐ সুন্দর ক্রিস্‌মাস ট্রির মতোই তুমিও মিলিয়ে যাবে।" এখন পাছে তার দাদি চলে যান তাই সে একটার পর একটা দেশলাই-কাঠি অতি দ্রুতভাবে জ্বালিয়ে যেতে লাগল। আর কাঠিগুলো জ্বলতে লাগল অপূর্ব রক্তিম আভায়, মধ্যদিনে সূর্যালোকও এত উজ্জ্বল হয় না। বুড়ি দাদিমাকে আর কখনো এরকম সম্ভ্রান্ত ও সুঠামদেহী মনে হয়নি। ইতোপূর্বে কখনোই তাঁকে এত রূপসী ও দয়াবতী মনে হয়নি। তিনি তাঁর ছোট নাতনিকে হাত বাড়িয়ে কোলে তুলে নিলেন, তারপর সুখে জ্বলজ্বল উড্ডীন হলেন দুজনে। পৃথিবীর অনেক উঁচুতে, আরো, আরো উঁচুতে তারা ভেসে ভেসে গেল; অবশেষে এসে পৌঁছুল সেখানে, যেখানে কনকনে ঠাণ্ডা নেই, ক্ষিধের কোনো বোধ নেই, কোনো জ্বালাযন্ত্রণার কথাও সেখানে কেউ কখনো শোনেনি : তারা পৌঁছে গেল ঈশ্বরের সামনে।

তখন সকাল হয়েছে সবেমাত্র। নিদারুণ শীত। সকলেই দেখল, গরিব মেয়েটি দেয়ালের এক কোণে হেলান দিয়ে আছে; তার সুকুমার গাল খুশিতে যেন চক্‌চক্ করছে, ঠোঁটের কোণে এখনো লেগে আছে হাসি; গত রাত্রে—পুরনো বছরের শেষ রাত্রে—সে মারা গেছে। নববর্ষের সূর্য মৃত কিশোরীর মুখে খেলা করতে লাগল; নিশ্চল বসে আছে সে, এখনো তার কোলে অনেক দেশলাইয়ের বান্ডিল, কেবল একটি বান্ডিল জ্বলতে-জ্বলতে নিঃশেষ হয়েছে।

কেউ কেউ বলল, "আহা, বেচারা নিজেকে একটু সেঁকে নেবার চেষ্টা করেছিল!" কিন্তু একজনও জানল না, কী অপূর্ব সব দৃশ্য দেখেছিল মেয়েটি; কেউ জানল না, দাদি-মাকে সঙ্গে নিয়ে সে কী জাঁকজমক করেই-না নববর্ষ উদ্‌যাপন করেছে।

www.pathagar.com

তুষার রানি

এক

মায়া মুকুর আর তার ভাঙা টুকরোর গল্প

এক ছিল দত্যি। ভারি পাজি ছিল দত্যিটা। সত্যি সত্যি দত্যি তো, একেবারে আস্ত জ্যান্ত একটা দত্যি। একদিন ভারি ফুর্তি লাগল তার মনে। আর সেই ফুর্তিতে একটা আয়না তৈরি করে ফেলল সে। আজব সে আয়না। ভালো আর সুন্দর কোনো জিনিসই দেখা যেত না তাতে। দুনিয়ার যত সব নোংরা আর বাজে জিনিস, আরো বেশি নোংরা আর পষ্ট হয়ে ফুটে উঠত তার বুকে। সেই আয়না দিয়ে দেখলে সুন্দর একছোপ সবজির বাগানকে মনে হত একতাল সেদ্ধ ঘণ্টার মতো, আর সবচেয়ে ভালো মানুষগুলোকে মনে হত একেবারে শয়তানের হাড্ডি—মনে হত মানুষগুলো যেন মাথার উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দেহ বলতে কিছুই যেন নেই তাদের। দত্যিটা ভাবত, "বেশ তো মজা!"

দত্যিটার আবার একটা ইস্কুলও ছিল। সেই ইস্কুলে গিয়ে যারা একবার ঘুরে আসে, তাদের মুখে আর তারিফ ধরে না। আজব আজব সব কথা বলত তারা। বলত, এ ইস্কুলে একবার না গেলে সারা জন্মেও দেখতে পাবে না, দুনিয়ার মানুষের আসল চেহারা। আয়নাটার পানে চেয়ে চেয়ে তারা টই টই করে দুনিয়ার সব আনাচে-কানাচে ঘুরে আসত। আর সব কিছু তন্ন তন্ন করে দেখে আসত! মাত্তর একটা দেশ কিংবা মাত্তর একটা মানুষ দেখা বাদ থাকলেও থামত না তারা। তারপর উড়ে চলত আকাশের দিকে। পরীদের দেখার জন্যে। কিন্তু যতই উপরের দিকে উঠত, ততই পিছল হয়ে উঠত আয়নাটা। এত পিছল যে, ধরে রাখা দায় হয়ে পড়ত। তবু আরো, আরো উপরে উড়ে যেত তারা। শেষে তাদের

www.pathagar.com

হাত থেকে আয়নাটা ফসকে পড়ে যেত মাটির দিকে, লাখ লাখ টুকরো হয়ে। তখনি বিপদ হত সবচেয়ে বেশি। বালির কণার চেয়েও সরু সরু টুকরো ভেসে বেড়াত হাওয়ায়। কোনোরকমে একবার কারো চোখে লাগলে, সেখানেই লেগে থাকত টুকরোগুলো, আর সে তখন থেকেই সব কিছুকে উলটো দেখতে শুরু করত। তা নয়তো সব কিছুরই কেবল খারাপ দিকটা দেখত, ভালোটা নজরেই পড়ত না। আয়নাটার গুণই ছিল পুরোতে যা, উনোতেও তাই। আবার, যারা হাঁ করে থাকত সব সময়, কিংবা বেশিরভাগ সময়, তাদের কারো কারো পেটেও ঢুকে যেতে কোনো কোনো টুকরো। তার ফল হত আরও সাংঘাতিক! সঙ্গে সঙ্গেই তার কলজে জমে যেত বরফের মতো।

এখন শোন এই কলজে জমে যাওয়া এক খোকার গল্প বলি।

দুই
বিরাট শহরের ছোট্ট খোকা-খুকু

মস্তো এক শহর। সেখানে থাকত দুটি ছেলে-মেয়ে। শহরটা ছিল খু-উ-ব বড়ো। লাখ লাখ লোকের বাস। বাড়ি-গাড়ি অগুণতি। জায়গার অভাবে ফুলের বাগান করতে পারত না অনেকেই, তাই ফুলদানিতে ফুল সাজিয়ে খুশি থাকতে হত অগত্যা। এমন জায়গাতেও সেই ছোট্ট খোকা-খুকুর একটা ফুলের বাগান ছিল। অনেকগুলো ফুলদানি পর পর সাজালে যত বড়ো হয়, তার চেয়েও বড়ো ছিল সেই বাগানটা। ওরা কিন্তু ভাইবোন নয়, তবুও একজন আরেকজনকে ভালোবাসত ঠিক ভাইবোনের মতো। ওদের বাবা আর মা থাকতেন পাশাপাশি দুটি বাড়িতে—ওপরতলায়। সেখানে একটা ঘরের ছাদ গিয়ে মিশেছে আরেকটা ঘরের ছাদের সঙ্গে, আর দুটো ঘরের মাঝ দিয়ে চলে গেছে একটামাত্র পানির পাইপ। ঘর দুটোতে ছিল মুখোমুখি দুটো জানলা। তাই, শুধু পানির পাইপটা টপকে যেতে পারলেই হল। এক জানলা থেকে আরেক জানলায় যাওয়া হয়ে যেত অনায়াসে।

ওদের বাবা-মাদের ছিল আবার একটা করে বিরাট বাক্স। সেই বাকসে লাগানো হত খাওয়ার জন্যে নানান রকম শাকসবজি। তা ছাড়া একটা করে ছোট গোলাপের ঝাড়ও ছিল বাক্সগুলোতে। ভারী সুন্দর ফুল ফুটত দুটো ঝাড়েই। এখন একদিন হয়েছে কী, দুজনেরই বাবা-মা বাক্সো দুটোকে রাখলেন পাইপটার এ-পাশে সরিয়ে। এতে দুটো জানলাই যোগ হয়ে গেল বাক্সে-বাক্সে। গোলাপের ঝাড় দুটোও বেড়ে উঠল পাশাপাশি কেয়ারির মতো। বাক্সগুলো ছিল উঁচু। খোকা-খুকু চড়তে পারত না তাদের উপর। তাই ওরা চড়ত বাক্সোগুলোর পেছনে ছাদের উপর। তারপর বসে হাওয়া খেত গোলাপের ঝাড়ের নিচে। কখনো-সখনো আবার খেলা করত একমনে।

কিন্তু শীত এলেই চলে যেত এমন নিশ্চিন্ত আরামের দিনগুলো।

জানলাগুলোর শার্সি ঢেকে যেত সাদা সাদা বরফের আস্তরণে। তখন এক চমৎকার ফন্দি আঁটত ওরা। তামার একটা পয়সা স্টোভে একেবারে আগুনের মতো গরম করে এনে ওরা ধরত বরফ-ঢাকা শার্সিগুলোতে। উঁকি মেরে দেখার জন্যে বেশ বড়ো একটা ফুটো হয়ে যেত তাতে। দুটো জানলারই ফুটোর পেছনে চক্‌চক্ করে উঠত ডাগর ডাগর দুজোড়া চোখ। চোখগুলো কিন্তু আর কারো নয়। আমাদের সেই ছোট্ট খোকা আর ছোট্ট খুকুর। ওহো, ওদের নামটাই বলা হয়নি?

www.pathagar.com

আচ্ছা শোনো: ওদের নাম কয় আর জেরদা !

"ঐ দেখ খোকা, কেমন ঝাঁকে ঝাঁকে সাদা সাদা মৌ-মাছিগুলো উড়ছে।" কয়ের দিদিমা বললেন একদিন। বাইরে তখন পুরু হয়ে পড়েছে বরফের আস্তরণ।

"রানি মাছি আছে ওদের?" শুধোল কয়। সে জানত আসল মৌ-মাছিদের মধ্যে রানি মাছি থাকবেই একটা।

"হুঁ, আছে বই কি," বললেন, দিদি। তারপর বললেন, "মাছির ঝাঁকটা যেখানে সবচেয়ে বেশি ঘন, সব সময় সেখানেই থাকে রানি মাছিটা। অনেকদিন নিশি রাতে তারা আসে কত পাহাড় জঙ্গল পেরিয়ে। প্রত্যেকটা জানলার দিকেই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। তারপর বরফে জমে যায় সবগুলো মাছিই। তখন কী আশ্চর্য সুন্দর দেখায় ওদের, মনে হয় যেনো এক-একটা ফুল আর পাপড়ি।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ আমিও দেখেছি !" এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল খোকা আর খুকু দুজনেই। এখন ওরা বুঝতে পারল কথাটা খাঁটি সত্যি !

"বলো না দিদি, বরফের রানি আসতে পারে আমাদের এখানে?" শুধোল ছোট্ট জেরদা।

"এসেই দেখুক না," বলে উঠল কয়। "গরম স্টোভটার ওপর বসিয়ে দেব তাকে। তারপর, আহা, কেমন গলে যাবে বেচারি !"

একদিন সন্ধ্যে বেলা। ছোট্ট কয় বাড়িতেই রয়েছে। জানলার পাশের চেয়ারটার উপরে দাঁড়িয়ে শার্সির ফুটোটা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল সে। চাপ চাপ বরফ পড়ছে বাইরে। তাদেরই একটা চাপ—সবচেয়ে বড়ো চাপটা—স্থির হয়ে রইল একটা ফুলের বাকসোর পাশ ঘেঁষে। তারপর ওটা আস্তে আস্তে আরো বড়ো হতে লাগল। শেষে তার জায়গায় দেখা গেল একটা মেয়ে, পরির মতো সুন্দরি। ফিনফিনে সাদা থানের কাপড় পরা। যেন হাজারটা তারার আলো দিয়ে বোনা তার কাপড়। পরীর মতো সুন্দরি মেয়েটা, কিন্তু বরফ দিয়ে গড়া তার শরীর—জ্বলজ্বলে চকচকে বরফ দিয়ে গড়া। জানলার পানে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল সে। ডাকল হাতছানি দিয়ে। ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল ছোট্ট কয়ের। চেয়ার থেকে লাফিয়ে পড়ে এক ছুটে হাওয়া হয়ে গেল সেখান থেকে। যেতে যেতে তার মনে হল যেন একটা বিরাট পাখি জানলার পাশ দিয়ে উড়ে চলে গেল শাঁই শাঁই করে।

পরের দিন। তুষার পড়া বন্ধ হয়ে এল আস্তে আস্তে। তারপর দেখা গেল উজ্জ্বল নীল আকাশ। বসন্তকাল এসে গেছে। সূর্যিমামা হামা দিয়েছেন গায়ে রাঙা জামা পরে। গাছে গাছে ফুটেছে ফুল। চড়ুই আর শালিকেরা কিচিরমিচির করে মনের আনন্দে বাঁধছে বাসা। আবার খুলে দেয়া হয়েছে বাড়ির জানলাগুলো। ছোট্ট খোকা-খুকুরা বসল তাদের বাগানে, উঁচু ছাদের মাথায়, সব কয়টা তলার উপরে। ছোট্ট জেরদা শিখেছিল একটা প্রার্থনার গান। তাতে ছিল গোলাপের কথা। নিজের গোলাপঝাড়টার কথা মনে পড়ত গাইতে গিয়ে। গানটা গেয়ে সে শোনাত ছোট্ট কয়কে, আর কয়ও গেয়ে শোনাত ওকে।

হাতে হাত রেখে আপন মনে গাইত ওরা। চুমো খেতো গোলাপের নরম পাপড়িগুলোতে। আর কথা কইত কাঁচা-কাঁচা রোদের সঙ্গে।

একদিন বাগানে বসে একটা ছবির বই দেখছে কয় আর জেরদা। তারপর হল কী, যখন ঠিক বারোটা বাজছে গির্জের ঘড়িটাতে, ঠিক তক্ষুনি হঠাৎ বলে উঠল কয়—

"উহ্, কী যেন একটা বাজল পেটে। আর চোখেও যেন পড়েছে কী।" ভয়ে খুকু জড়িয়ে ধরল ওকে। চোখে পলক ফেলল কয়। নাঃ, কিছুই দেখা গেল না চোখে।

www.pathagar.com

"ওটা পড়ে গেছে চোখ থেকে," ভাবল কয়। কিন্তু আসলে পড়েনি। ওটা কী তা জান? ওটা ছিল সেই মায়া আয়নার একটা ছোট্ট কুচি।

বেচারা কয়ের পেটের ভেতরেও ঢুকে গেছে একটা টুকরো। আর সঙ্গে সঙ্গেই পেটের ভেতরে একটা বরফের টুকরোর মতো হয়ে গেছে সেটা। এখন কোনো ব্যথা লাগছে না কয়ের। কিন্তু ওটা পেটের ভেতরে রয়ে গেল ঠিকই।

"কাঁদছ কেন?" বলল কয়। "ইস্, কী কালো আর কুৎসিত দেখাচ্ছে তোমাকে! কেঁদো না, আমার তো কিছুই হয়নি। এই, দেখ দেখ," আশ্চর্য হয়ে বলল কয়, "পোকায় খেয়ে কেমন বিচ্ছিরি করে দিয়েছে ঐ গোলাপটা। আর এটা তো একেবারে শুকিয়ে গেছে। মা, মা, গোলাপটা কী নোংরা!" তারপর সে লাথি মেরে উল্টে দিল বাকসোটা, ছিঁড়ে ফেলল দুটো গোলাপই।

"কয়, কী হল তোমার?" আরো ভড়কে গিয়ে শুধাল জেরদা। ওর ভয় দেখে আরো একটা ফুল ছিঁড়ে ফেলল কয়। তারপর ছুটে পালিয়ে গেল ওর কাছ থেকে।

পরে যখন আবার ছবির বইটা নিয়ে জেরদা গেল কয়ের কাছে, কয় নাক সিঁটকে বলল, "ওটা আবার একটা বই নাকি! বেবিরাই শুধু ওটাকে ভালো বলবে।" দিদি কোনো গপ্প বলতে গেলেই 'কিন্তু' 'কিন্তু' করে বারবার বাধা দিতে লাগল সে। আর ফাঁক পেলেই দিদির চশমাটা নাকের ডগায় দিয়ে বুড়োমি করে দিদির ভঙ্গিতেই কথা বলতে থাকে। যা কিছু খারাপ আর কুৎসিত, তারই নকল করতে লাগল কয়। লোকে বলতে লাগল, নিশ্চয়ই সেই অলক্ষুনে আয়নার টুকরো ঢুকেছে ওর চোখে আর পেটে। নইলে এমন পাগলামি করবে কেন? ছোট্ট জেরদা, যে কিনা তাকে ভালোবাসে সারাটা প্রাণ দিয়ে, তাকেও ভারি বিরক্ত করতে লাগল সে।

তার খেলা-ধুলোর রীতিও গেল পালটে। আগের মতো ছোট্ট খোকাখুকুদের খেলা আর খেলত না সে।

শীতকাল। একদিন মোটা মোটা দস্তানা পরে, ইয়া বড়ো একটা শ্লেজ গাড়ি কাঁধে ঝুলিয়ে এল সে। জেরদাকে ডেকে বলল, "বড়ো মাঠটায় খেলতে যাব আজকে। আর আর সব ছেলেও ওখানে খেলে।" বলে হাওয়া হয়ে গেল মুহূর্তে।

বড়ো স্কোয়ারে গাঁয়ের চাষিদের ঘোড়ার গাড়ির সঙ্গে নিজের শ্লেজটা বেঁধে দিত অনেক দুরন্ত ছেলে। এই করে বেড়াতও বেশ কিছুদূর। ভারী মজা হত এতে। সেদিন এমনি করে ওদের সঙ্গে খেলছিল কয়। হঠাৎ একটা বড়ো শ্লেজ গাড়ি এসে পড়ল ওদের মাঝে। গাড়িটা একেবারে ধপধপে সাদা। তার মধ্যে বসে একজন লোক। সাদা পশমি কাপড় জড়ানো তার গায়ে। মাথায় একটা সাদা টুপি। গাড়িটা দুপাক ঘুরল স্কোয়ারের চারদিকে, আর তার সঙ্গে নিজের শ্লেজটা জুড়ে দিয়ে কয়ও ঘুরল মজা করে। তারপর জোরে চালিয়ে পরের সড়কটা ধরে শোঁ শোঁ করে এগিয়ে চলল গাড়িটা। লোকটা এবার পেছন ফিরে এমন ভাবে ঘাড় নাড়ল কয়ের পানে চেয়ে যেন কত চেনা ওর। কয় তার গাড়িটা ছাড়িয়ে নিতে চাইলেই এমনি ভঙ্গি করে লোকটা। তাই কয়ও থাকে যেমনকার তেমন। এভাবে শহরের গেট পেরিয়ে গেল তারা।

তখন এমন বরফ পড়তে শুরু করেছে যে, নিজের নাকের ডগাটা পর্যন্তও ভালো করে দেখতে পাচ্ছে না কয়। কিন্তু গাড়িটা তখনো চলেছে সমান জোরে। এখন সে তাড়াতাড়ি হাতের দড়িটা ছেড়ে দিল, যাতে আলগা হয়ে যায় তার গাড়িটা। কিন্তু কোনো কাজেই এল না। গাড়িটা ভারি শক্ত করে বাঁধা হয়ে গেছে বড়ো শ্লেজটার সঙ্গে আর হাওয়ার বেগে

www.pathagar.com

চলেছে সেই স্লেজ। ভয়ে কয় তো আধখানা। কোনো উপায় না পেয়ে গলা ছেড়ে চিৎকার করে উঠল সে, কিন্তু কেউ শুনল না সে চিৎকার। চাপ চাপ বরফ পড়ছে আকাশ থেকে, আর স্লেজটা এবার উড়ে চলেছে উপরের দিকে। একদম ঘাবড়ে গেল কয়। প্রার্থনা করতে চাইল, কিন্তু আঁককষার নামতাটা ছাড়া আর কিছুই মনে এল না তার।

ক্রমে ক্রমে বরফের চাপগুলো বড়ো হতে লাগল। শেষে তারা বরফ থেকে হয়ে গেল একপাল সাদা মুরগি। ঝট করে একলাফে সরে দাঁড়াল তারা। বড়ো স্লেজটাও গেল থেমে। লোকটা এবার গাড়ি থেকে উঠে দাঁড়াল। তার পশমি কাপড় আর টুপিটা ছিল পুরোপুরি বরফের তৈরি। ওগুলো খসে পড়তেই দেখা গেল লোকটা আসলে একটা মেয়ে। লম্বা পাতলা চকচকে সাদা একটা মেয়ে।

তুষার দেশের রানি—তুষারকন্যা!

"গাড়িটা চালিয়েছিলাম বেশ!" বলল সে। "কিন্তু তুমি কাঁপছ কেন ঠক্‌ঠক্‌ করে? আমার পশমি কাপড়টা পরে নাও চটপট।" তারপর কয়কে নিয়ে নিজের স্লেজে বসাল। পশমি কাপড়টা জড়িয়ে দিল ওর গায়ে। কয়ের মনে হল যেন বরফের সমুদ্দুরে ডুবে যাচ্ছে সে।

"এখনো ঠাণ্ডা লাগছে তোমার?" শুধোল তুষারকন্যা। তারপর চুমো খেল ওর কপালে। আহ্, বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা সে ছোঁয়া! হাড় কাঁপিয়ে দিল কয়ের। কলজেটার তো আদ্দেক বরফ হয়ে আছে আগেই। মায়া আয়নার টুকরো পেটে গিয়ে। মনে হল যেন জমে যাচ্ছে সে। কিন্তু মুহূর্তের জন্যে। তারপর সব ঠিক হয়ে গেল। আর একটুও ঠাণ্ডা লাগছে না কয়ের।

"আমার স্লেজ, আমার স্লেজটা কোথায়?"

প্রথমে স্লেজটার কথাই ওর মনে পড়ল। কিন্তু ওটা হারায়নি। একটা সাদা মুরগির ডানায় বেশ শক্ত করে বেঁধে দেয়া হয়েছে। আর তাই পিঠে ফেলে উড়ে চলেছে মুরগির পাল।

এবারে তার কপালে আরেকটা চুমো খেল তুষারকন্যা। সঙ্গে সঙ্গেই সে ভুলে গেল জেরদাকে, দিদিকে, আর বাড়ির সব কিছুকে। মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল কয়।

"আর তোমাকে চুমো খাব না," বলল তুষার কন্যা। "আর একটা চুমো খেলেই মরে যাবে তুমি।"

তার দিকে চোখ তুলে চাইল কয়। কী সুন্দর আর কী মায়াভরা মুখ, স্নেহভরা চোখ! মনেই হয় না তার দেহটা তুষারের—জানলার কাছে দাঁড়িয়ে তাকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছিল যখন, ঠিক তখনকার মতো দেখতে! একটুও ভয় লাগল না তার। পাহাড়-পুকুর আর সাগর-নদীর উপর দিয়ে উড়ে চলল তারা উল্কার মতো। নিচে পাগলা হাওয়ার মাতামাতি। নেকড়েরা ডাকছে আর পৃথিবীটা ছেয়ে যাচ্ছে সাদা সাদা বরফের কণায়। উপরে আকাশ নীল, কালো কালো কাকের ঝাঁক চলেছে হাওয়ায় পাখা মেলে। সবার উপরে জ্বলছে পূর্ণিমার নিটোল গোল চাঁদটা। এমনি করে চলতে চলতে শীতের লম্বা রাতটা কেটে গেল। সকাল হতে দেখা গেল সেই তুষারকন্যার পায়ের কাছে গুটিশুটি মেরে অঘোরে ঘুমুচ্ছে কয়।

তিন

ডাইনি বুড়ির ফুলবাগানে

এদিকে কয় তো আর ফিরল না। তখন জেরদার মনের অবস্থা কী হল জানো? সে খোঁজ নিতে লাগল সবার কাছে, কয়ের কী হল? কেউ বলতে পারল না তার কথা। কয়ের সঙ্গে

www.pathagar.com

খেলছিল যে ছেলেগুলো, শুধু তারা বলতে পারল দু'একটা কথা। তারা বলল তারা দেখেছে—কয় তার শ্লেজটা বাঁধল বড় একটা শ্লেজের সঙ্গে। তারপর দুটো শ্লেজই শাঁই শাঁই করে চলে গেল বড়ো সড়কটা ধরে। সড়কটা ছেড়ে শহরের গেটটা পেরিয়েও চলে গেল গাড়ি দুটো। ব্যস, এই পর্যন্ত। আর কিছু জানে না তারা। অনেকগুলো মানুষই কাঁদল কয়ের জন্যে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি কাঁদল ছোট্ট জেরদা। দিনরাত কেবল কাঁদল আর কাঁদল। তারপর ভাবল কয় মরে গেছে। ইস্কুলের পাশে দিয়ে যে ছোট্ট নদীটা বয়ে চলেছে তাতেই ডুবে মরে গেছে কয়—জেরদা ভাবল। উহ্, কী আঁধার-করা বরফে ঢাকা শীতের দিন ছিল তখন! কিন্তু এখন আবার এসেছে বসন্ত। গরম সূর্যের আলো-ঝলমলে দিন।

"কয় মরে গেছে," বলল জেরদা।

"বিশ্বাস করি না," বললে সূর্যের আলো।

"কয় মরে গেছে," এবার চড়ুইদের ডেকে বলল জেরদা।

"বিশ্বাস করি না," বলল তারাও। তাই শেষ পর্যন্ত আর কথাটা বিশ্বাস করল না জেরদা নিজেও।

"নতুন লাল জুতোগুলো পরে যাব নদীর কাছে," একদিন সকালে বলল জেরদা। "তারপর নদীকে বলব কয়কে ফিরিয়ে দিতে। আমার এই জুতোগুলো দেখেনি কয়।" তখনো সবে সকাল। বুড়ি দিদি ঘুমুচ্ছে অঘোরে। তাঁকে আদর করে চুমো খেল জেরদা। তারপর লাল জুতোগুলো পরে একা একা শহরের গেটটা পেরিয়ে নদীর দিকে চলে গেল সে।

"সত্যি করে বল আমার ছোট্ট খেলার সাথীকে তুমিই নিয়েছ কিনা," নদীকে মিনতি করে বলল জেরদা। তারপর আবার বলল, "তোমাকে এই লাল জুতোগুলো দিয়ে দেব যদি ওকে ফিরিয়ে দাও আমার কাছে।"

মনে হল নদীর ঢেউগুলো দুলে উঠল কথা বলার ভঙ্গিতে। তাই সে জুতোগুলো খুলে হাতে নিয়ে জোরে ছুড়ে মারল নদীর বুকে। এই জুতোগুলোকেই কিনা সে ভালোবাসত সবচেয়ে বেশি। কিন্তু ছোট্ট ছোট্ট ঢেউয়েরা জুতোগুলো ফিরিয়ে নিয়ে এল কূলের দিকে, ওর পায়ের কাছে। ও ভাবল জুতোগুলো ঠিকঠিক দূরে গিয়ে পড়েনি। নইলে ফিরে আসবে কেন ওর কাছে? কাছের ঝোপটার মধ্যে লুকনো ছিল একটা ছোট্ট নৌকো! এবার নৌকোটাতে চড়ে আরো দূরে ছুড়ে মারল জুতোজোড়াটা। কিন্তু নৌকোটা ভালো করে বাঁধা ছিল না, তাই ঝাঁকুনিতে কূল থেকে সরে গিয়ে ছুটে চলল তরতর করে।

ভারি ভয় পেল ছোট্ট জেরদা। কাঁদতে লাগল ভয়ে। কিন্তু কেউ শুনতে পেল না তার কান্না। কেবল শুনতে পেল নদীর পারের চড়ুইয়েরা। কিন্তু শুনেই-বা কী করবে বেচারিরা? ওরা তো আর কূলে বয়ে আনতে পারবে না ওকে। তাই ওরা কূল ধরে উড়ে উড়ে গাইতে লাগল যেন ওকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যেই, "এই তো আছি আমরা! ভয় কী তোমার—এই তো আছি আমরা!"

"হয়তো নদীই আমাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ছোট্ট কয়ের কাছে," ভাবল জেরদা। ভেবে খুব খুশি হয়ে উঠল সে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা নৌকোয় দাঁড়িয়ে আনমনে তাকিয়ে রইল উঁচু, সবুজ, ঘাসে ঘেরা নদীর পাড়ের দিকে। তারপর সে এসে পৌঁছল একটা বিরাট কেয়াবনের পাশে। বনটার মধ্যে ছিল লাল-নীল জানলাওয়ালা অদ্ভুত রকমের একটা ঘর। ঘরটার উপরে একটা নড়বড়ে চালা। বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল দুটো কাঠের সেপাই। ওর নৌকোটা পাশ

www.pathagar.com

দিয়ে যাবার সময় ওর হাতে কিছু অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে দিল কাঠের সেপাইরা। ওদের জ্যান্ত ভেবে ডাকল জেরদা। ওরা অবিশ্যি কোনো সাড়া দিল না। ওদের খুব কাছে চলে এল জেরদা। ওকে এখন কূলের দিকে বয়ে নিয়ে এসেছে নদী।

আরো জোরে ডাকল জেরদা। এবার ঘর থেকে লাঠিতে ভর দিয়ে বেরিয়ে এল একেবারে থুরথুরে এক বুড়ি। প্রকাণ্ড একটা হ্যাট তার মাথায়। ফুলে ফুলে ছাওয়া সেই হ্যাটটা।

"আহা, বাছা আমার" বলল বুড়ি, "কী করে এলে এই বিরাট নদী পাড়ি দিয়ে? আর কী করেই–বা এলে এমন ভাসতে ভাসতে এত দূরে?" তারপর এক হাঁটু জলে নেমে, লাঠিটা দিয়ে নৌকোটা কাছে টেনে এনে, জেরদাকে কোলে তুলে ডাঙায় নিয়ে এল বুড়ি। জেরদা বেশ খুশিই হল আবার ডাঙায় উঠতে পেয়ে। মনে মনে ভয়ও কিছু কম হল না এই অচেনা বুড়ির রাজ্যে এসে।

"বলো তো খুকুমণি, কে তুমি, আর কেনই–বা এসেছ এখানে?" শুধোল বুড়ি। জেরদা তাকে বলল সব কথা। বুড়ি মাথা নেড়ে বলল, "হুঁ, হুঁ!" তারপর জেরদা তাকে জিজ্ঞেস করল, "কয়কে দেখেছ তুমি?" সে বলল, "না, দেখিনি। এই পথে আসেনি এখনো কয়। তবে আসবে শীগগীরই।" তারপর বলল, "দুঃখ কোরো না, লক্ষ্মী খুকু। কেয়াবনটা আর ফুলগুলোর দিকে চেয়ে দেখ। কী সুন্দর, না? ছবির বইয়ের চাইতেও সুন্দর।" বুড়ি তাকে আরো বলল, ফুলগুলো প্রত্যেকেই একটা করে গপ্‌প বলতে জানে। বলে ওকে হাত ধরে ঘরটার ভেতরে নিয়ে গেল। ঘরে ঢুকে দরজাটা দিল বন্ধ করে।

ঘরের জানলাগুলো খুব উঁচু আর তাদের শার্সিগুলো লাল, নীল, হলুদ—হরেক রঙের। শার্সির ভেতর দিয়ে দিনের উজ্জ্বল আলো ঘরে এসে পড়ছে সাতরঙা রামধনুর চাকা এঁকে। টেবিলের উপরে কতকগুলো মিষ্টি চেরিফল। জেরদা পেট ভরে ফল খেলো। খাওয়ার সময় ওর সুন্দর চুলগুলো একটা সোনার চিরুণি দিয়ে আঁচড়ে দিল বুড়ি। ওর ফুটফুটে সুন্দর মুখের দুপাশে ঝুলে রইল কুঁচবরণ দুগোছা চুল। শীতের সকালে শিশির–ভেজা নতুন–ফোটা গোলাপের মতো দেখাচ্ছিল ওর কচি সুন্দর মুখটা।

"অনেকদিন ধরেই চাচ্ছিলাম তোমার মতো সুন্দর একটা ছোট্ট লক্ষ্মী–খুকু," চুলে সিঁথি কাটতে কাটতে বলল বুড়ি। "এখন দেখবে কত সুখে থাকব আমরা।" বুড়ির চুল আঁচড়ে দেয়ার সময় জেরদা যেন একে একে ভুলে যেতে লাগল কয়ের সব কথা। বুড়ি তো আসল বুড়ি নয়। ডাইনি বুড়ি! জাদু–মন্তর করতে জানত সে। তবে সে খারাপ ডাইনি নয়—এই যা। এমনি সে এক–আধটু জাদুমন্তর করত নিজের খেয়াল–খুশি মতো। এখন সে জেরদাকে জাদু করল যাতে জেরদা পালিয়ে না যায় তার কাছ থেকে। তারপর সে তার বাগানে গিয়ে হাতের লাঠিটা ঘোরালো গোলাপ–ঝাড়গুলোর উপর, আর চোখের পলকে মাটির তলায় সেঁধিয়ে গেল সবগুলো ঝাড়। কোনো চিহ্নই আর রইল না তাদের। বুড়ির ভয় ছিল, গোলাপগুলো দেখলে হয়তো নিজের বাড়ির গোলাপ–ঝাড়টার কথা মনে পড়ে যাবে জেরদার আর সে–কথা মনে হতেই কয়ের কথা মনে পড়তে কতক্ষণ! আর তক্ষুণি যাবে পালিয়ে।

এখন জেরদাকে নিয়ে যাওয়া হল ফুলের বাগানে। আহা, কী সুন্দর ফুলগুলো, আর কী মিষ্টিই–না তাদের গন্ধ! হরেক রকমের ফুল ফুটেছে বাগানে। তাদের কতকগুলো আবার বারমেসে ফুল। রঙের আলপনায় ছবির বইকেও হার মানিয়ে দেয়। জেরদা তো মহাখুশি! দিনভর খেলা করল ফুলগুলোর সঙ্গে। তারপর উঁচু চেরি গাছগুলোর ওপাশে এক সময়

www.pathagar.com

সুয্যিমামা পাটে নামলেন। নামল রাতের আঁধার। লাল রেশমি বালিশে সিথান দিয়ে নরোম তুলতুলে একটা বিছানায় শুয়ে পড়ল জেরদা। কত স্বপ্ন দেখল ঘুমের মধ্যে। কত সুন্দর সে স্বপ্ন! বিয়ের রাতের পরিদের রানি যেমন স্বপ্ন দেখে তার চেয়েও সুন্দর।

পরের দিনও তেমনি খেলা করে কাটাল ফুলগুলোর সঙ্গে। পরের দিন—তার পরের দিনও। এমনি করে কেটে গেল অনেক দিন। সব ফুলই চেনা হয়ে গেছে জেরদার। বাগানে এত ফুল তবু যেন কী একটা ফুল নেই। কিন্তু সে ফুল কিছুতেই জেরদার মনে পড়ে না।

তারপর একদিন—না, হয়েছে কী?

ডাইনি বুড়ির ফুলে ছাওয়া সেই যে টুপিটা—তার দিকে জেরদার চোখ পড়ল। দেখল ওর মধ্যে রয়েছে সবচেয়ে সুন্দর একটা ফুল—একটা গোলাপ!

বাগানের গোলাপ-ঝাড়গুলো জাদু করার সময় এই ফুলটা সরিয়ে ফেলতে মনে ছিল না বুড়ির। কিন্তু এত সব গুছিয়ে মনে রাখাও কী ছাই চারটিখানি কথা? এমনি একটু ছোট্ট ভুলের জন্যে কত মারাত্মক ক্ষতিই—না হয়ে যায় আমাদের।

"এ্যাঁ তাই তো! বাগানে তো কোনো গোলাপঝাড় নেই।" মনে পড়ে গেল জেরদার।

বাগানে গিয়ে এ-ঝাড়, ও-ঝাড়, অনেক ঝাড়ই খুঁজল জেরদা। কিন্তু কোথাও গোলাপের ঝাড় পাওয়া গেল না একটাও। দুঃখে মাটিতে আছড়ে পড়ল জেরদা। অঝোরে কাঁদতে লাগল সে। তার চোখের জলের এক ফোঁটা পড়ল, যেখানে একটা গোলাপের কুঁড়ি সেঁধিয়ে রয়েছে ঠিক সেই জায়গাটার ওপরে। চোখের জলের গরম ছোঁয়া পেয়ে কয়েকটা ফোটা ফুল নিয়ে শুট করে গজিয়ে উঠল গোলাপের ঝাড়টা। আহা, তখন কী খুশি জেরদার। গাছটাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে চুমো খেল সে। আহা, নিজের বাড়ির ফুলগুলোর কথা মনে পড়ে গেল তার। তার পরেই মনে পড়ল কয়ের কথাও।

"উহ্, কী ফন্দি করেই—না আটকে রেখেছে আমাকে!" মনে মনে বলল জেরদা। "আমি-না কয়ের খোঁজে বেরিয়েছিলাম! তোমরা আমার কয়ের খবর জানো?" গোলাপগুলোকে শুধোল সে। "কয় কি আজো বেঁচে আছে—বল না গো!"

"হ্যাঁ গো খুকুমণি, তোমার কয় আজো বেঁচে আছে।" গোলাপগুলো মাথা দুলিয়ে বলল। "মাটির নিচেই তো ছিলাম আমরা। সব লোকই মরে গেলে যায় মাটির নিচে। কিন্তু কয়কে তো দেখিনি সেখানে।"

"আমার লক্ষ্মী গোলাপ, খুব ভালো তোমরা।" আদর করে জেরদা বলল, তারপর গেল অন্য ফুলগুলোর কাছে। তাদের কুঁড়ির পানে তাকিয়ে শুধোল, "তোমরা জানো কয় কোথায় আছে?"

কিন্তু ফুলগুলো তখন রোদে গা মেলে দিয়ে আপন মনে ভাবছিল শুধু তাদের নিজের নিজের গপ্প-কাহিনী, কিংবা কোনো এক রাজপুত্তুর আর রাজকন্যার রূপকথা। তাদের অনেক রূপকথাই শুনল জেরদা, কিন্তু কয়ের কথা কে-উ বলতে পারল না।

"ছাই গপ্প! ও-সবতো শুনতে চাইনি তোমাদের কাছে।" বিরক্ত হয়ে মাথা দুলিয়ে বলল জেরদা। "বসে বসে তোমাদের ও-সব শুনতে আমার বয়েই গেছে।"

তারপর সে দৌড়ে গেল বাগানের এক্কেবারে শেষ মাথায়। দরজাটা ছিল বন্ধ। কিন্তু জোরে ধাক্কা মারতেই মরচে-ধরা তালাটা গেল ভেঙে আর দরজাটা গেল খুলে। খালি পায়ে খোলা মাঠটার দিকে প্রাণপনে দৌড়ুতে লাগল ছোট্ট জেরদা। দৌড়োয় আর বার বার পেছন ফিরে তাকায়। নাঃ, কেউ আসছে না পেছন পেছন।

www.pathagar.com

দৌড়ুতে—দৌড়ুতে, জেরদা হাঁফিয়ে যায়—আর চলতে পারে না। শেষে একটা উঁচু পাথরের উপর বসে জেরদা জিরোয়। চারদিক চেয়ে দেখে—গরমের দিন চলে গিয়েছে, এখন হেমন্তকাল।

জেরদা আশ্চর্য হয়ে যায়! ডাইনি বুড়ির বাগানে এটা বোঝা যায়নি। সেখানে সব ঋতুতেই রোদে ঝলোমলো। বারোমাস ফুল ফোটে।

"আহা, কত সময় বয়ে গেল আমার!" দুঃখ হয় জেরদার মনে।

"হেমন্ত এসে গেছে। আর বিশ্রামের সময় নেই।"

উঠে দাঁড়াল জেরদা। আবার পথ চলবে সে। কিন্তু, আহ্, কী ব্যথা ওর ছোট্ট দুটি পায়ে! টনটন্ করে উঠছে পা দুটো। ঠাণ্ডাও পড়েছে কী ভীষণ।

চারদিকে শুধু ধু ধু করা মাঠ আর মাঠ। হলদে হয়ে গেছে সবগুলো গাছের পাতা। শিশির ঝরছে যেন বিষ্টির মতো—টিপ্ টিপ্, টিপ্ টিপ। একে একে খসে পড়ছে গাছের পাতাগুলো। ফুল নেই ফল নেই কোনো গাছে। শুধু হিজলগাছে দেখা যাচ্ছে জটা জটা দুটো একটা ফল। কিন্তু হিজলের ফল খাওয়া যায় না। বড্ড টক। দাঁত কনকন করে। টকিয়ে যায় মুখ। ইস, কী ভীষণ আঁধার হয়ে এসেছে চারিদিক।

চার

রাজপুত্তুর আর রাজকন্যের দেশে

জেরদা আর চলতে পারে না। ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। একটু জিরোতে বসল এমনি সময় ঠিক ওর উল্টো দিক থেকে বরফের উপর লম্বা লম্বা পা ফেলে ভারিক্কি চালে হেলতে দুলতে এসে পৌঁছুল কুচকুচে কালো একটা কাক। ওর সামনে এসেই থমকে দাঁড়াল কাকটা। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল এক দৃষ্টিতে। তারপর একটু হেসে, ঘাড় কাত করে বলল, "কা! কা! নমস্কার! নমস্কার!" এর চাইতে ভালো করে কথা বলতে পারল না কাকটা। কিন্তু তাকে বেশ মিতের মতো মনে হল জেরদার। জেরদাকে সে শুধোল একা ও কোথায় চলেছে এই বিরাট বিশ্বে। "একা" কথাটা খুব ভালো করেই বুঝল জেরদা। ওর মনটা ব্যথায় কেঁদে উঠল কথাটা শুনে। তার জীবনের সব কাহিনী আর দুঃখের কথা বলল কাকটাকে। তারপর শুধোল সে কয়কে দেখেছে কিনা কোথাও। সব কথা শুনে খুব গম্ভীর হয়ে গেল কাকটা। তারপর হঠাৎ সে বলে উঠল,

"হুঁ, দেখেছি তো মনে হয়! দেখেছি তো!"

"কী! দেখেছ মনে হয়? বটে?" আনন্দে লাফিয়ে উঠল জেরদা। কাককে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগল সে। কাকটার দম প্রায় বন্ধ হয়ে এল ওর দুই হাতের চাপে।

"আস্তে, আস্তে, খুকুমণি!" বলল কাকটা। "মনে হয় দেখেছি। কয়ই হবে হয়তো। কিন্তু ও নিশ্চয়ই এখন ভুলে গেছে তোমার কথা। রাজকন্যের সঙ্গে থাকে কি না!"

"রাজকন্যের সঙ্গে থাকে?" শুধোল জেরদা।

"হুঁ। শোনো," বলল কাকটা। "কিন্তু তোমার ভাষায় কথা বলা কী মুস্কিল। কাকের ভাষা জানো? তাহলে বলতে পারি আরো ভালো করে।"

"না, ও-ভাষাটা শিখিনি তো," বলল জেরদা। "তবে আমার দিদিমা বোঝেন—বলতেও পারেন তোমাদের ভাষা। আহা কেন শিখিনি আমি!"

www.pathagar.com

"না, না, তাতে কিছু অসুবিধে হবে না," ব্যস্ত হয়ে বলল কাকটা। "যদ্দুর সম্ভব বুঝিয়ে বলব তোমায়।" কাক জেরদাকে সান্ত্বনা দেয়।

তার পর কাকটা তার জানা সব কথা বলতে লাগল—

"আমরা যে দেশে থাকি সেই দেশে আছে এক রাজকন্যে। রাজকন্যের ভারী বুদ্ধি। দুনিয়ায় যত খবরের কাগজ রয়েছে তার সবগুলো মুখস্ত করেছে। আর ভুলেও গেছে সেগুলো। এত-তো বুদ্ধি সেই রাজকন্যের।

"একদিন সিংহাসনে বসে রাজকন্যে আপন মনে একটা গান গাইছিল—বিয়ের গান। বুঝতেই তো পারছ কথাটার মানে কী?" কাকটা বলল। "রাজকন্যের বিয়ে করতে ইচ্ছে হয়েছে। কিন্তু রাজকন্যে এমন একজনকে বিয়ে করতে চায় যে, সব কথার চটপট উত্তর দিতে পারবে। বোকার মতো হাঁ করে কেবল চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না, তা সে দেখতে যত সুন্দর হোক। তাহলে বরকে যে ভারী বোকা বোকা দেখাবে।

"রাজকন্যে সখিদের ডেকে মনের কথা বলল। শুনে সখিরা মহা খুশি। ওরা বলল, 'কথাটা এদ্দিন ধরে আমরাও ভাবছিলাম।' "আমি যা বলছি তার প্রতিটা কথা যে সত্যি, তাতে কোনো সন্দ নেই, বুঝলে খুকুমণি।" কাকটা বলল। "আমার বউ আবার সব সময় রাজকন্যের পুরীতে যাওয়া আসা করে কিনা, তাই অনেক খবরই তার কানে আসে। সে-ই আমায় এ খবর বলেছে।"

কাকের বউ-ও অবিশ্যি একটা কাক। কাকের বউ তো কাকই হয়। সে তো তোমরা জানোই।

"সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশ করা হল কতকগুলো খবরের কাগজ। চওড়া বর্ডার দিয়ে, রাজকন্যের সইয়ের নকল দিয়ে, খুব ফলাও করে। কাগজগুলোতে ঘোষণা করে দেয়া হল যে, দেখতে সুন্দর সব যুবকই আসতে পারে রাজপুরীতে। এসে কথা বলবে রাজকন্যের সঙ্গে। আর যে কথা বলতে পারবে সবচেয়ে সুন্দর করে আর যার কথা শুনে মনে হবে যে একটুও ভয় নেই তার মনে, তাকেই বিয়ে করবে রাজকন্যে। হ্যাঁ, হ্যাঁ," জোরের সঙ্গে বলল কাক, "আমাকে বিশ্বাস করতে পার তুমি। আমার কথাগুলো সব সত্যি। এখানে তোমার সামনে বসে আছি—এ যেমন সত্যি, ঠিক তেমনি সত্যি। ভীষণ হৈ-চৈ পড়ে গেল। দলে দলে আসতে লাগল যুবকেরা। কিন্তু পয়লা কিংবা দোসরা দিনেই নাকাল হয়ে গেল সবাই। বাইরে সড়ক দিয়ে আসবার সময় চমৎকার কথা বলতে পারত তারাও। কিন্তু যখনি তারা এসে পৌঁছুতো রাজপুরীর গেটে, দেখত ঢাল-তরোয়াল উঁচিয়ে সব সেপাই-শান্ত্রি, বিরাট সিঁড়িটা বেয়ে যেত উপরে আলো-ঝল্‌মল্ হল-ঘরটার ভেতরে, সামনে পড়ত সব সোনার জামাজুতো পরা নফর-বান্দা, তখনি মাথাটা ঘুরে যেত তাদের, আর চোখে দেখত কেবল লাল-হলদে সব সর্ষেফুল। তারপর যখন গিয়ে দাঁড়াত খোদ সিংহাসনটার সামনে—যার উপর বসে আছে রাজকন্যে, তখন আর কোনো কথাই মনে আসত না তাদের। কেবল ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আওড়াত রাজকন্যেরই মুখের শেষ কথাটা। কিন্তু নিজের বলা কথাটাই অন্যের মুখে ফের শুনতে মোটেই ভালো লাগত না রাজকন্যের। লোকগুলো যেন ঘুমিয়ে পড়ত কোনো ঘুমের ওষুধ খেয়ে, ফের সড়কে গিয়ে না পড়া পর্যন্ত জেগে উঠত না আর। তখন পর্যন্ত আর খুশিমতো কথা বলতে পারত না তারা। শহরের গেট থেকে রাজকন্যের বাড়ির গেট পর্যন্ত বিরাট এক লাইন বেঁধে দাঁড়িয়েছিল তারা। আমি নিজে গিছলাম

www.pathagar.com

দেখতে," বলল কাক। "ক্ষিধেয় আর তেষ্টায় মুখ কাঁচুমাচু হয়ে গিছল তাদের। কিন্তু রাজপ্রাসাদ থেকে এক গেলাস জলও পেল না তারা।"

"কিন্তু কয়, ছোট্ট কয়?" শুধোল জেরদা। "কখন এল কয়? নাকি লাইনের মধ্যে ছিল সে-ও?"

"রোসো, রোসো! ওর কথাতেই তো আসছি। পয়লা দিন গেল। দোসরা দিনও গেল। তেসরা দিন এল নতুন একজন লোক। ছোট্ট খাট্টো একজন লোক। কোনো গাড়ি-জুড়ি ছিল না তার। খুশি মনে হেঁটেই সে চলে গেল রাজপুরীতে। তার চোখগুলো ঠিক তোমার চোখের মতোই উজ্জ্বল। খুব লম্বা সুন্দর চুল তার। তবে কাপড়গুলো একেবারেই সাদামাটা।"

"তাহলে সে-ই কয়!" খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠল জেরদা। "এইবার পেয়েছি তাকে!" আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল সে।

"তার পিঠে একটা পুটলি," বলল কাক।

"হুঁম! ওটা নিশ্চয়ই ওর শ্লেজটা!" বলল জেরদা। "শ্লেজটা নিয়েই ও বেরিয়েছিল কি না।"

"হতে পারে," সায় দিয়ে বলল কাক। "তবে আমি খুব খেয়াল করে দেখিনি ওটা। আমার বউই আমাকে বলেছে সব কথা। বউ বলেছে, ও গেটের ভেতর দিয়ে ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে উঠল উপরে। ঢাল-তরোয়ালধারী সেপাই-শান্ত্রি আর সোনার জামাজুতো-পরা বান্দা-নফরদের দেখে একটুও নাকি ভয় করেনি সে। বরং একটু চিন্তা করে বলল, 'ধ্যেৎ, সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকব কী? চলে যাই ভেতরে।' আলোয় আলোময় হয়ে উঠল হল-ঘরটা। সোনার কাপ-পেয়ালা হাতে নিয়ে খালি পায়ে ঘুরঘুর করছিল উজির-নাজির আর কোটালেরা। এসব দেখলে ভয়ে বুক শুকিয়ে যেত আর যে-কারুরই। কিন্তু ওর ভয় হল না একটুও। ওর জুতোগুলো পর্যন্ত আওয়াজ করা থামাল না।"

"নিশ্চয়ই কয়!" চেঁচিয়ে উঠল জেরদা। "ওর পায়ে ছিল নতুন বুট। দিদিমার ঘরে ওর জুতোর মচমচানি শুনেছি আমি।"

"হ্যাঁ, জুতোগুলো মচমচ করছিল ঠিকই," বলল কাক। "আর ও একটুও ভয় না করে সোজা চলে গেল রাজকন্যের কাছে। বিরাট একটা মুক্তোর উপর বসেছিল রাজকন্যে। সুতো কাটার চরকার চাইতেও বড় সে মুক্তোটা। আর রাজকন্যের চারদিক ঘিরে দাঁড়িয়েছিল তার সব সহচরীরা, সহচরীদের সহচরীরা, সহচরীদের সহচরীদেরও সহচরীরা আর তাদের বাঁদীরাও। আর ছিল ঘোড়সওয়ার সামন্তেরা, সামন্তদের সামন্তেরা, আর শেষ সামন্তদের সঙ্গের লোকেরা। এই লোকেদের প্রত্যেকের সঙ্গে ছিল আবার একজন করে নফর। ভীম পালোয়ানের মতো দাঁড়িয়েছিল তারা সব। সামন্তদের সামন্তদের সঙ্গের লোকেদের নফরদের দাপটে কাছে ঘেঁষা যেত না রাজপ্রাসাদের। চটিজুতো পরে চটাস্ চটাস করে সব সময় ঘুরে বেড়াত তারা।"

"উহু, তাদের দেখে ভীষণ ঘাবড়ে যেত সবাই, না?" নিজেই ঘাবড়ে গিয়ে ঢোক গিলে শুধোল জেরদা। "কয় পেল রাজকন্যেকে?"

"আমি যদি কাক হয়ে না জন্মাতাম, তাইলে আমি নিজেই বিয়ে করতাম রাজকন্যেকে। অবশ্যি আমার একটা পরির মতো সুন্দরী বউ আছে," বলল কাক। জানোই তো, কাকেরা কাকের মতো কুচকুচে কালোকেই বলে কিনা 'পরীর মতো সুন্দরী'! তারপর বলল কাক,

www.pathagar.com

"শুনেছি আমি যেমন বলতে পারি আমার ভাষায়, ও তেমনি সুন্দর করে কথা বলেছিল রাজকন্যের সঙ্গে। বউয়ের মুখেই শুনেছি এ-কথা। ভারী চঞ্চল আর হাসিখুশি ছেলেটি। 'আমি তোমাকে বিয়ে করতে আসিনি, এসেছি শুধু তোমার বিদ্যের কথা শুনতে,' সে বলল রাজকন্যেকে। দুজনেরই ভারী পছন্দ হয়ে গেল দুজনকে।"

"নিশ্চয়ই সে কয়," বলল জেরদা। "কত বুদ্ধি ছিল ওর। মুখে মুখে ভগ্নাংশে পর্যন্ত করে ফেলতে পারত। আমাকে নিয়ে চলো-না ওর কাছে!" মিনতি করে বলল জেরদা।

"বলা কত সহজ!" বলল কাক। পায়ের আঙুল দিয়ে মাথা চুলকাতে লাগল সে মহা ভাবনায়। "কিন্তু যাব কী করে বল? আমার বউয়ের সঙ্গে আলাপ করব এ নিয়ে। ও একটা পথ বের করতে পারে হয়তো। কিন্তু একটা কথা বলে রাখছি তোমাকে খুকুমণি, তোমাকে ওরা রাজপ্রাসাদের ভেতরে যেতে দেবে না কিছুতেই।"

"দেবে, দেবে," বলল জেরদা। "আমার কথা শুনলেই কয় সোজা চলে আসবে আমার কাছে। তারপর সে-ই ভেতরে নিয়ে যাবে আমাকে।"

"ঐ খানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা কর আমার জন্যে," বলে পাখা মেলে উড়ে চলে গেল কাকটা।

ফিরে যখন এল তখন সন্ধের আঁধার নেমে এসেছে চারদিকে।

"কা! কা!" বলল সে। "আমার বউ তোমাকে ভালোবাসা জানিয়েছে গো খুকুমণি। আর এই রুটিটা দিয়েছে তোমার জন্যে। বলল, 'ক্ষিধে পেয়েছে নিশ্চয়ই খুকুমণির। ওকে খেতে দিও এ-টা। রান্নাঘরে ছিল অনেকগুলোই, তার মধ্যে থেকে নিয়ে এলাম একটা।' তুমি বোধ হয় যেতে পারবে না রাজপ্রাসাদের ভেতরে। রুপোর সেপাই আর সোনার শান্ত্রিরা যেতে দেবে না তোমাকে। তবে ভয় নেই, অন্য ব্যবস্থা আছে। কেঁদো না তুমি। খিড়কির কাছে একটা ছোট্ট সিঁড়ি জানা আছে তোমার বউদির। সেটা দিয়ে একেবারে গিয়ে পৌঁছনো যায় রাজকন্যের শোবার ঘরের বারান্দায়। তারপর চাবিটা কোথায় পাবে তা-ও জানে তোমার বউদি।"

তারপর কাক-বউদি জেরদাকে খিড়কি দরজার কাছে নিয়ে গেল। দরজাটা খোলাই ছিল।

ভয়ে আর আনন্দে বুকটা কেমন ধড়ফড় করতে লাগল ছোট্ট জেরদার! যেন কোনো ভীষণ অন্যায় করতে যাচ্ছে আর কী! তবু কয়কে দেখার কত ইচ্ছে তার!

এবার সিঁড়িটা বেয়ে উঠল তারা। একটা ছোট্ট পিদিম জ্বলছিল সিঁড়ির মাথায় মিটমিট করে। রাজকন্যের শোবার ঘরের বারান্দায় এসে এদিক-ওদিক ভালো করে দেখে নিল গিন্নি কাকটা। তারপর তাকাল জেরদার দিকে। জেরদা মাথা হেঁট করে পেন্নাম করল তাকে, যেমন শিখিয়েছেন দিদিমা।

"আমার কর্তা খুব স্নেহ করেন তোমাকে খুকুমণি," বলল কাকের বউ। "আহা, তোমার কাহিনী কী দুঃখের! আচ্ছা পিদিমটা হাতে নিয়ে এসো আমার পিছু পিছু। ইদিক দিয়ে সোজা চলে যাব আমরা। কেউ দেখতে পাবে না আমাদের।"

এবার তারা এসে পৌঁছল পয়লা মহলটায়। কিংখাবে মোড়া দেয়ালগুলো আর হরেক রঙের ফুল-পাতা আঁকা রয়েছে তার উপর। প্রত্যেকটা মহলকেই মনে হয় আরগুলোর চাইতে সুন্দর। এত সুন্দর আর ঝকঝকে যে, চোখে ধাঁধা লেগে যায় দেখে। মহলগুলো

www.pathagar.com

পেরিয়ে তারা এসে পৌঁছল শোবার ঘরটায়। এ ঘরের ছাদটাকে মনে হল বিরাট একটা তালগাছের প্রকাণ্ড একটা মাথার মতো। বড়ো বড়ো ছাতার মতো গোল পাতায় ভর্তি। পাতাগুলো সব দামি কাচে তৈরি। কাচগুলো সব ফটিকের মতো পরিষ্কার। ঘরের মাঝখানে সোনার পালঙ্কের উপর মখমলের দুটি বিছানা। দেখতে যেন সদ্য-ফোটা পদ্মফুলের মতো। সাদা বিছানাটার উপরে শুয়ে ঘুমোচ্ছে রাজকন্যে। আরেকটা বিছানা ছিল লাল। পলাশফুলের মতো একেবারে টুকটুকে লাল। জেরদা ভাবল কয় আছে সেখানে। একটা লাল পাতা সরিয়ে নুয়ে পড়ে দেখল সে। দেখলো শ্যামবরণ ছোট্ট একটা ঘাড়।—কয় নিশ্চয়ই, ভাবল জেরদা। জোরে চেঁচিয়ে উঠল ওর নাম ধরে। পিদিমটা উঁচিয়ে ধরল ওর মুখের কাছে। ও জেগে উঠল। পাশ ফিরে তাকাল জেরদার দিকে। কিন্তু আহা, সে তো কয় নয়!

কেবল ঘাড়ের দিকটাতেই কয়ের মতো দেখাত রাজপুত্তুরকে। কিন্তু আসলে সে ছোট্ট কয় নয়। সে আরো বড়, আর, দেখতেও অনেক বেশি সুন্দর। সদ্য-ফোটা পদ্মফুলের বিছানায় ঘুম ভেঙে গেল রাজকন্যের। ঘুমজড়ানো মিষ্টি সুরে শুধোল, "ওখানে কে?" আহা, দুঃখে শোকে কেঁদে ফেলল ছোট্ট খুকু জেরদা। একে একে বলে গেল তার সব দুঃখের কাহিনী। মুক্তোর মতো দুফোঁটা চোখের জল ছলছল করে গড়িয়ে পড়ল ওর দু'গাল বেয়ে।

"আহা বেচারি!" দরদে ভেঙে পড়ল রাজপুত্তুর আর রাজকন্যে। কাক দুটোর খুব প্রশংসা করল তারা। আর বলল ওদের ওপর রাগ করেনি তারা। তবে বলল আর যেন এ-রকম না করে কাকগুলো। অবিশ্যি এবারের জন্যে পুরস্কার দেয়া হবে তাদের।

"তোমরা কি স্বাধীনভাবে উড়ে বেড়াবে?" শুধোল রাজকন্যে, "না কি রাজসভায় স্থায়ী কাকমন্ত্রীর আসন নেবে, তা নিলে তোমরা পাকশালের এঁটো-কাঁটার একচ্ছত্র অধিকার পাবে।"

কর্তা কাকের সঙ্গে একটু সলা-পরামর্শ করল তার বউ। তারপর দুজনেই মাথা নুইয়ে পেন্নাম করল রাজকন্যেকে। রাজদরবারে স্থায়ী আসনই বেছে নিল তারা। বলল, তিনকাল গিয়ে এককালে এসে ঠেকেছি এখন আমরা। শেষের দিনগুলোর জন্যে একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা থাকাই ভালো।"

রাজপুত্তুর তার লাল ফুলের বিছানাটা ছেড়ে দিল জেরদাকে, ঘুমোবার জন্যে। আর কী-ই বা করা যায় তখনকার মতো। ছোট্ট দুখানি হাত বুকের ওপর জোড় করে ধরল জেরদা। আর মনে মনে ভাবল, মানুষে আর পাখিতে কত ভালোবাসে আমাকে! কত ভালো তারা!" তারপর আস্তে আস্তে চোখ দুটি বুঁজে এল তার।

পরের দিন। সকালবেলা। মাথা থেকে পা পর্যন্ত সারাটা গা ঢেকে মখমল আর জরির পোশাক পরিয়ে দেয়া হল জেরদাকে। রাজপুরীতে মহা আনন্দে দিন কাটাবার ব্যবস্থা হল তার। কিন্তু সে চাইল শুধুমাত্র একটা ঘোড়া আর একটা ছোট্ট গাড়ি, আর একজোড়া বুটজুতো। তারপর আবার সে বেরিয়ে পড়বে কয়ের খোঁজে। কিন্তু তাকে শুধু একজোড়া বুটজুতোই দেয়া হল না, টুকটুকে লাল রঙের একটা মাফলারও দেয়া হল তাকে। আর, ফুটফুটে সুন্দর পোশাকে সাজিয়ে দেয়া হল। তারপর যখন সে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে ঠিক তখুনি খাঁটি সোনা দিয়ে গড়া একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল দুয়ারের সামনে। গাড়িটার উপরে নীল আকাশের উজ্জ্বল তারার মতো জ্বলজ্বল করে জ্বলছিল রাজপুত্তুর

www.pathagar.com

আর রাজকন্যের মুকুটের চিহ্ন। কোচমান, গাড়োয়ান, চড়নদার—কারণ চড়নদারও ছিল গাড়িটাতে—সবাই পরেছিল মাথার উপরে একটা সোনার মুকুট। রাজপুত্তুর আর রাজকন্যে স্বয়ং এসে গাড়িতে তুলে দিল জেরদাকে, আর আশীর্বাদ করল দুই হাত তুলে। বনের কাক দুটোর পাকাপাকি বিয়ে হয়ে গেছে এখন। কর্তা কাকটা তিন মাইল গেল জেরদার সঙ্গে। জেরদার পাশেই বসেছিল সে, কারণ পেছনে বসাটা অপমানজনক মনে হচ্ছিল তার। সে এখন রাজসভার মন্ত্রী হয়েছে কি না, তাই। তার বউ আর জেরদার সঙ্গে গেল না, কারণ রাজসভায় স্থায়ী আসন পেয়ে বেশি খেয়ে খেয়ে ভীষণ মাথা ধরেছিল তার। তাই দুয়ারে বসে ডানা ঝাপ্টাতে লাগল সে, বিদায়ের শুভেচ্ছা জানিয়ে। গাড়িটার ভেতরে থরে থরে সাজিয়ে দেয়া হয়েছিল হরেকরকম মিষ্টি বিস্কুট আর ফল।

"বিদায় বন্ধু, বিদায়!" বলে কেঁদে ফেলল রাজপুত্তুর আর রাজকন্যে। কান্না পেল ছোট্ট জেরদারও। আর কাঁদতে লাগল কাকটা। কেঁদে আকুল হল সবাই। এমনি গেল প্রথম তিন মাইল। তারপর "বিদায়!" বলল কাকটা। তখুনি সবচে বেশি দুঃখ লাগছে জেরদার। কাকটা উড়ে গিয়ে বসল একটা গাছের ডালে আর তার কালো কালো দুটি ডানা ঝাপ্টাতে লাগল যতক্ষণ পর্যন্ত দেখা গেল গাড়িটা। সকালের মিষ্টি কাঁচা রোদের মতো উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল গাড়িটা।

পাঁচ

ক্ষুদে ডাকু মেয়ের বিজন বাড়িতে

জ্বলন্ত মশালের মতো পথ আলোকিত করে গহীন বনবাদাড়ের ভেতর দিয়ে চলছে গাড়িটা। দেখে চোখ ঝলসে গেল বনের কয়েকটা ডাকাতের। লোভ আর সাম্‌লাতে পারল না তারা।

"সোনার গাড়ি! সোনার গাড়ি!" বলে চেঁচিয়ে উঠল তারা। দৌড়ে এসে পাকড়াও করল ঘোড়াগুলোকে। তারপর তারা খুন করে ফেলল সব কোচম্যান, গাড়োয়ান আর চড়নদারদের, আর গাড়ি থেকে টেনে নামিয়ে আনল জেরদাকে।

"বাহ্, কী তুলতুলে—কেমন সুন্দর মেয়েটা—বেশ নাদুস-নুদুস তো!" বলল ডাকাতের সর্দার বুড়ি। লম্বা জটা-পাকানো একরাশ দাড়ি ছিল বুড়ির, আর চোখের মোটা ভ্রুতে চোখগুলো ঢেকে গিছেল তার। জেরদার দিকে তাকিয়ে আবার বলল বুড়ি, "মেয়েটা দেখতে যেন ঠিক একটা ছোট্ট ভেড়ির বাচ্চা। খেতে ভারী মজা হবে মেয়েটাকে।"

তারপর একটা ধারাল ছুরি তুলে ধরল সে। রোদের মধ্যে কী ভয়ঙ্করভাবে চিকচিক করে জ্বলে উঠল ছুরিটা!

কিন্তু তখুনি "উহ্" বলে চিৎকার করে উঠল বুড়ি। কারণ, তার পিঠে ঝোলানো তারই ছোট্ট মেয়েটা জোরে কামড়ে দিয়েছে তার কানটা। "পাজি শয়তান কোথাকার!" ভীষণ গাল দিয়ে উঠল সে। জেরদাকে খুন করার আর সময় পেল না বুড়ি।

"ও খেলবে আমার সঙ্গে," বলল ক্ষুদে ডাকু মেয়ে। "ওর মাফলারটা আর সুন্দর পোশাকটা দেবে আমাকে, আর আমার সঙ্গেই শুয়ে ঘুমোবে আমার বিছানায়।"

বলে, আবার ভীষণ কামড়ে দিল মেয়েটা। ব্যথার চোটে একেবারে তিনহাত লাফিয়ে উঠে ঘুরে দাঁড়াল সর্দার বুড়ি। তাই-না দেখে খিলখিল করে হেসে উঠল ডাকাতের দল।

www.pathagar.com

"ঐ গাড়িটাতে চড়বো আমি," বলল ক্ষুদে ডাকু মেয়েটা, আর তার কথাই সই। কারণ ভারি একগুঁয়ে মেয়েটা। অতি আদরে একেবারে বয়ে গিয়েছিল সে। জেরদাকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িটাতে উঠে বস্‌ল সে, আর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চালাতেও লাগল খুব জোরে। মাথার মাপে জেরদারই সমান মেয়েটা কিন্তু তার গায়ে ছিল ভীষণ জোর আর কাঁধগুলোও ছিল রীতিমতো চওড়া। গায়ের রং ছিল রাঙতার মতো ঝলসানো সাদা আর চোখদুটো ছিল একেবারে কাকের মতো মিশমিশে কালো। ছোট্ট জেরদার কোমর জড়িয়ে ধরে বলল সে, "আমি তোমার ওপর রাগ না-করা পর্যন্ত তোমাকে খুন করবে না ওরা। তুমি একজন রাজকন্যে, না?"

"না," বলল জেরদা। তারপর বলে গেল তার সব কাহিনী। আর বলল কত ভালোবাসে সে ছোট্ট কয়কে।

ক্ষুদে ডাকু মেয়েটা মুখ ভার করে তাকাল জেরদার দিকে। তারপর বলল আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে, "আমি রাগ করলেও ওরা খুন করবে না তোমাকে। কারণ তখন আমি নিজেই তোমায় খুন করব।"

তারপর জেরদার চোখ মুছিয়ে দিয়ে ওর সুন্দর নরোম মাফলারটা নিয়ে নিল সে।

ডাকাতদের কেল্লার সামনে এসে দাঁড়াল গাড়িটা। কেল্লাটার চুড়ো থেকে গোড়া পর্যন্ত সবটাই ভাঙা। ওদের দেখে দাঁড়কাক আর পাতিকাক আর আরো সব ছোট ছোট পাখি ফুড়ুৎ করে উড়ে বেরিয়ে যেতে লাগল বড় বড় ফোকরের ভেতর থেকে। কেল্লার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল মস্তো বড় বড় কতকগুলো ডালকুত্তা। এক-একটা যেন আস্ত মানুষ খেয়ে ফেলতে পারে। বিকট মুখভঙ্গি করে তারা লাফিয়ে উঠল উঁচুতে, কিন্তু ডাকল না। কারণ, ডাকতে মানা ছিল তাদের।

বিরাট ঘরটার পাথরের মেঝের ঠিক মাঝখানে একটা উনুন। গনগনে আগুন জ্বলছিল তাতে। উনুনটার উপরে একটা প্রকাণ্ড কড়াই। কড়াইটাতে মস্ত মস্ত কয়েকটা খরগোস আস্ত ভাজা হচ্ছিল তখন। খাওয়া-দাওয়া, পরে ডাকু মেয়েটা বললে জেরদাকে, "আমার আর আমার পোষা জন্তুগুলোর সঙ্গে আজ রাতে ঘুমোবে তুমি।" বলে ওর হাত ধরে নিয়ে গেল ঘরের এক কোণে, যেখানে একটা মস্তো খড়ের গাদা বিছিয়ে তার উপরে পাতা হয়েছিল একটা নরোম কার্পেট। কার্পেটটার উপরে চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়েছিল একশোটা পায়রা! ঘুমিয়েই ছিল পায়রাগুলো, কিন্তু ওরা আসতেই একটু নড়েচড়ে ঠিক হয়ে শুলো তারা।

"এগুলো সব আমার" বললে ডাকু মেয়েটা। তারপর খপ করে ধরে ফেললে হাতের কাছের একটা পায়রা। পা দুটোকে আলতো করে ধরে এমনভাবে ঝাঁকানি দিল যে, ঝটপট করে ডানা ঝাপটাতে লাগল পাখিটা। জেরদার মুখের কাছে ধরে আদেশ করল, "চুমো খাও পাখিটাকে!" দেয়ালের একটা বড় ফোকরে রাখা খাঁচার দিকে দেখিয়ে বলল, "ঐ দুটো কাঠ ঠোকরা। ভারি পাজি ওগুলো। খাঁচার দরজাটা একটু ফাঁক করেছ কি ফুড়ুৎ করে পালিয়ে যাবে। আর এই হচ্ছে আমার প্রিয় বন্ধু 'বা' বলে শিং ধরে টেনে আনল একটা বলগা হরিণ। পেতলের চকচকে পালিশ-করা একটা চাকতি পরা তার গলায়। "'বা'-কেও বন্দি করে রাখতে হয় সাবধানে," বললে সে, "নইলে সুযোগ পেলেই কেটে পড়বে সে-ও। প্রতি সন্ধেয় একটা লম্বা ধারাল ছুরি দিয়ে ওর গলায় সুড়সুড়ি দিই আমি, ফলে ভীষণ ঘাবড়ে যায় বেচারি।"

www.pathagar.com

বলে একটা লম্বা ছুরি বার করল সে দেয়ালের এক ফোকর থেকে। তারপর সুড়সুড়ি দিতে লাগল হরিণটার গলায়। চার পা ছুড়ে লাফাতে লাগল বেচারি হরিণটা, আর তাই দেখে হেসে কুটিকুটি হল দস্যি মেয়েটা। তারপর জেরদাকে টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

"ঘুমোবার সময়ও কি ছুরিটা সঙ্গে নিয়ে শোও তুমি?" শুধোল জেরদা, আর ভয়ে ভয়ে তাকাতে লাগল ছুরিটার দিকে।

"আমি সব সময়ই ছুরিটা সঙ্গে নিয়ে ঘুমোই," বলল ডাকু মেয়ে। "কখন কী ঘটে বলা যায় না তো! যাক, এখন আবার আমাকে শোনাও তো তোমার কয় নামের লক্ষ্মী ভাইটির কথা, আর কেনই-বা তুমি বেরিয়ে এলে এই বিরাট বিশ্বে।" জেরদা আবার তাকে শোনাল তার কাহিনী। বনের পায়রাগুলো "কু, কু," করে ডাকল তাদের খাঁচায়। অন্য পায়রাগুলো রইল ঘুমিয়ে। ডাকু মেয়েটা এক হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরল, আরেক হাতে ধরে রাখল ছুরিটা। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুম এল না জেরদার। দুচোখের পাতা এক হল না তার। বাঁচবে কি মরবে তাই জানে না সে। ডাকাতগুলো বসে আছে আগুনের চারদিক ঘিরে। হরদম খাচ্ছে আর নাচছে আর ফূর্তি করছে তারা। কী ভীষণ! দেখে ভয়ে এতটুকু হয়ে গেল সে।

তারপর হঠাৎ ডেকে উঠল বনের পায়রাগুলো। "কু! কু!" বলল তারা। "কয়কে দেখেছি আমরা। সাদা প্যাঁচাতে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তার শ্লেজ গাড়িটা। তুষার রানির গাড়িতে বসে ছিল কয়। কু! কু! বনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল সেই গাড়িটা। আমরা ছিলাম সেই বনে। কু! কু! তুষার রানি দিলেন ফুঁ, আর অমনি মরে গেল সবগুলো পায়রা। বেঁচে রইলাম শুধু দুইজন। কু! কু! আমরা দুজন। কু! কু!"

"কী বলছ তোমরা?" শুধোল জেরদা। "কোথায় যাচ্ছিল তুষারকন্যে? জানো তোমরা? জানো তার কিছু?"

"খুব সম্ভব লাপল্যান্ডেই যাচ্ছিল গো। সে-দেশে বরফ থাকে হরহামেশা। ঐ হরিণটাকেই জিজ্ঞেস কর না। দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে যে হরিণটা। তোমার কাছেই আছে বাঁধা।"

"বরফ আর তুষার থাকে হরহামেশা, দেখতে বেশ সুন্দর, খুব মজার সে-দেশ," গানের মতো করে বলে উঠল হরিণটা। "সেখানে তুমি ঘুরে বেড়াতে পার যেমন খুশি। বরফের রানি গরমের দিনে তাঁবু ফেলে সেখানে। কিন্তু তার আসল দুর্গটা হচ্ছে উত্তর মেরুতে, সেই যেখানে আছে একটা দ্বীপ। দ্বীপটার নাম স্পিট্‌স্‌বার্জেন।"

"আহা কয়! ছোট!" কঁকিয়ে উঠল জেরদা।

"চুপচাপ ঘুমোবে কি না? নইলে দোব ছুরিটা দিয়ে একেবারে এফোঁড়-ওফোঁড় করে!" গর্জে উঠল দস্যি মেয়েটা।

সকালে উঠে জেরদা সব কথা বলল ডাকু মেয়েকে। বলল তাকে কী বলেছে বনের পায়রাগুলো, আর লম্বা শিংওয়ালা গলায় পেতলের চাকতি পরা হরিণটা। শুনে খুব গম্ভীর হয়ে ভাবতে লাগল ডাকু মেয়ে। তারপর বলল মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে "তাইতো! তাইতো!" বলে শুধোল হরিণটাকে, "লাপল্যান্ড চেন নাকি তুমি?"

"আমার চাইতে বেশি আবার চেনে নাকি কেউ?" চোখ কপালে তুলে পরম আশ্চর্য হয়ে গিয়ে বলল হরিণটা। তার কপালে দপ করে জ্বলে উঠল একজোড়া ড্যাবড্যাবে চোখ। "আমার জন্ম হল গিয়ে সে-দেশে" বলল সে, "আর আমি মানুষও তো হলাম সেইখানেই!

www.pathagar.com

আহা, ছেলেবেলা কত ধুলো খেলাই না করেছি সে-দেশের বরফ-গলা ধূ-ধূ করা মাঠের পরে!" ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে দারুণ ব্যথায় কেঁপে উঠল তার গলার স্বর।

"তাহলে শোনো," ক্ষুদে ডাকু মেয়েটা বলল জেরদাকে। "সবাই চলে গিয়েছে দেখছ। কেবল মা আছে এখনো। সে থাকবেও এখানেই। তবে প্রত্যেক দিনই দুপুরের দিকটাতে বড় বোতলটা থেকে খুব খানিকটা ওষুধ খেয়ে সে ঘুমোয় কতক্ষণ! তখন দেখব আমি কী করতে পারি তোমার জন্যে।"

এই-না বলে সে লাফ দিয়ে উঠে গেল বিছানা থেকে। তারপর মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে আচ্ছা জোরে টানতে লাগল তার লম্বা দাড়িগুলো, আর বলল, "সুপ্রভাত, আহা আমার আদরের মা গো। আমার হোঁৎকা বুড়ি মা গো!" তার মা তখন নাক দিয়ে তার মুখে খোঁচাতে লাগল। খোঁচাতে খোঁচাতে নাকটা তার ব্যথায় একেবারে লাল আর নীল হয়ে গেল। এ সবই হল কিন্তু শুধু খুশি আর আদরের জন্যে!

বুড়ি মা ওষুধ খেয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোবার পরে ডাকু মেয়ে তার হরিণটাকে গিয়ে বলল আদর করে, "ছুরিটা দিয়ে তোমাকে আরো খানিকটা সুড়সুড়ি দিতে ভারী ইচ্ছে হয় আমার। কারণ খুব মজার দেখায় তখন তোমাকে। কিন্তু নাঃ, আর তোমাকে দুঃখু দেব না। তোমার দড়ি খুলে দিচ্ছি আমি, যাতে করে তুমি যেতে পার লাপল্যান্ডে। তবে পা চারখানাকে খুব চালু করে যেতে হবে তোমাকে, আর এই ছোট্ট মেয়েটিকে নিয়ে যেতে হবে পিঠে করে। ওকে নিয়ে যাবে তুষার রানির পুরীতে। ওখানেই আছে ওর খেলার সাথীটি। তুমি তো শুনেইছ, ও যা-যা বলেছে আমাকে। কারণ ও বলছিল বেশ জোরে-জোরেই, আর তুমিও শুনছিলে কান পেতে।"

হরিণটা লাফিয়ে উঠল আনন্দে। ডাকু মেয়ে তার পিঠে চড়িয়ে দিল ছোট্ট জেরদাকে। বুদ্ধি করে ওকে বেঁধে দিল ভালো করে, যাতে পড়ে না যায়। বসতে দিল নিজের ছোট্ট আসনটা।

"তোমরা পশমি জুতোজোড়াটা নিয়ে যাও খুকু," বলল সে, "কারণ খুব ঠাণ্ডা পড়ে সে-দেশে। কিন্তু তোমার মাফলারটা দেব না আমি খুকুভাই, কী সুন্দর মাফলারটা। তবে এ-জন্যে তোমার কষ্ট হবে না কিছু। এই যে আমার মায়ের বড় বড় দস্তানাগুলো দিলাম তোমাকে। বাহ্, তোমার কনুই পর্যন্ত ঢেকে যাচ্ছে দস্তানায়! এখন ঠিক আমার কুচ্ছিৎ বুড়ি মায়ের মতোই দেখাচ্ছে তোমাকে!" বলে খুশির চোটে হেসে উঠল সে। কিন্তু জেরদা তখন কাঁদছিল আনন্দে।

"দেখ বলছি, ছিচকাঁদুনে মেয়ে একদম দেখতে পারি না আমি," বলল ডাকু মেয়ে। "না, মোটেই কাঁদতে পারবে না তুমি। খুশি মনে যেতে হবে তোমাকে। এই দুটো রুটি আর মাংস নিয়ে যাও। ক্ষিধেয় আর কষ্ট পাবে না পথে।"

এ সবই বেঁধে দেওয়া হল হরিণটার পিঠে। ডাকু মেয়ে তারপর দরজাটার কাছে এসে, বড় বড় কুকুরগুলোকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ভাগিয়ে দিয়ে, ধারাল ছুরিটা দিয়ে কেটে দিল হরিণটার গলায় বাঁধা দড়িটা। হরিণটাকে বলল সে, "যাও এবার। কিন্তু দেখ যেন কোনো কষ্ট না হয় ওর।" তারপর ওর দস্তানা-পরা দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল জেরদা, "বিদায় বন্ধু!"

হরিণটা ছুটল পাহাড়-জঙ্গল, খাল-বিল পার হয়ে, নদীটা বাঁয়ে ফেলে ডাইনের মাঠটার উপর দিয়ে। ছুটল ছুটল—কেবল ছুটল সে, যত জোরে পারে। পেছনে হাঁকছে নেকড়েরা আর সামনে ডাকছে কাকেরা, চিলেরা। মাথার উপরে আকাশে জ্বলে উঠল লাল আলো। যেন আগুন ধরে গেছে আকাশটায়।

www.pathagar.com

"ওগুলো আমার সেই সেকালের উত্তুরে বাতির সারি," বলল হরিণটা। "দেখ কেমন জ্বলছে বাতিগুলো!" ছুটতে ছুটতেই বলল সে। বলে ছুটতে লাগল আরো—আরো জোরে। কী দিনে কী রাতে একটুও থামল না সে। কেবল ছুটল আর ছুটল। কিন্তু লাপল্যান্ডে এসে যখন পৌঁছল তারা ততদিনে ফুরিয়ে গেল তাদের রুটি আর মাংসের খাবার।

ছয়

লাপল্যান্ডের দিদিমা আর ফিনল্যাণ্ডের ঠাকমা

জেরদাকে পিঠে নিয়ে একটা ছোট্ট কুঁড়েঘরের সামনে এসে হরিণটা থামল। ঘরটা এমন নড়বড়ে জরাজীর্ণ যে দেখলে মনে হয় এই বুঝি ভেঙে পড়ে। ছাদটা হেলে গিয়ে প্রায় মাটির সাথে এসে ঠেকেছে। আর দরজাটা এত নিচু যে চার-হাত-পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে যেতে-আসতে হয়। ঘরে তখন শুধু এক বুড়ি রয়েছে। গ্যাসের আগুনে সেঁকে তখন মাছ রান্না করছিল লাপল্যান্ডের এই দিদিমা। হরিণ তার কাছে এসে বলল, "পেন্নাম দিদিমা!" তারপর একে একে বলে গেল জেরদার সব কথা। তার আগে অবিশ্যি নিজের কথা বলে নিয়েছে। ও ভেবে নিয়েছে তার নিজের কাহিনীই বুঝি অনেক বেশি সরেস।

দিদিমা সব শুনে বলল, "আহা বাছারা! কিন্তু তুষারকন্যের খবর তো আমি বেশি জানিনে। তার খবর আমার চেয়েও ভালো জানে আমার সই—তোমাদের ফিনল্যান্ডের ঠাকমা। এখন তুষারকন্যেও শুনেছি সেই দেশেই আছে। রোজ সন্ধেবেলা 'বেঙ্গল লাইট' দিয়ে আরতি করে। তা সে যে অনেক দূরের পথ গো নাতনি—আরো একশো মাইল গিয়ে তবে যেতে হবে ফিনল্যান্ডের ঠাকমার বড়ি। তা, আমি তোমাদের একটা পত্তর লিখে দিচ্ছি শুটকি মাছের উপর। আমার আবার কাগজ নেই কিনা! তোমরা সেই পত্তর নিয়ে আমার সইকে দিয়ো। তাহলে সে-ই তোমাদের সব সন্ধান বলে দেবে।"

তারপর জেরদাকে আদর করে খাইয়ে-দাইয়ে শুটকি মাছে লিখন দিয়ে হরিণের পিঠে চাপিয়ে দিল। হরিণের পিঠে চাপিয়ে বেশ ভালো করে বেঁধে দিল যাতে পড়ে না যায়। বলে দিল, "বেশ যত্ন করে সাবধানে রেখে দিয়ো কিন্তু পত্তরটা। হারিয়ে যায় না যেন।"

হরিণটা আবার চার পায়ে ঝড়ের বেগ এনে ছুটতে লাগল।

ছুটতে ছুটতে, ছুটতে—

এক সময় এসে থামল ফিনল্যান্ডের ঠাকমার বাড়িতে। ঠাকমার বাড়িতে আবার একটাও দরজা ছিল না।

তাই জেরদা আর কী করে?

শেষ পর্যন্ত ঘরের চিমনিতেই টুক, টুক করে টোকা দিল জেরদা।

ঘরের ভেতরটা এত গরম ছিল যে, ঠাকমা নিজেই প্রায় আদুল গায়ে পায়চারি করছিল। তাই জেরদাকে ঘরে ঢুকিয়ে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই তার পশমি দস্তানা, জুতো, সব খুলে নিল। নইলে গরমে মরেই যেত জেরদা। আর হরিণটার মাথায় এক চাপ বরফ দিয়ে দিল। তারপর ঠাকমা জেরদার কাছ থেকে শুটকি মাছের লিখনটা নিয়ে পড়তে লাগল। শেষে বারবার, তিনবার পড়ে পত্তরটা একেবারে মুখস্ত হয়ে গেল ঠাকমার। মুখস্ত হয়ে যাওয়ার

www.pathagar.com

পর ঝোল-রান্নার কড়াইয়ের ফুটন্ত জলের মধ্যে শুটকিটা ছেড়ে দিল। দেবেই-বা না কেন! কোন জিনিসই যে ঠাকমা বিনি কাজে নষ্ট হতে দেয় না।

এরপর হরিণটা সেই আগের বারের মতো ঠাকমার কাছে আগে নিজের কাহিনী বলল। তারপর বলল জেরদার দুঃখের কাহিনী। ঠাকমা তার ধূর্তোমিভরা চোখ তুলে পিটপিট করে ওদের দিকে চেয়ে সব শুনে গেল একে একে। একটা কথাও বলল না। তখন হরিণটা বলল, "ঠাকমা, তোমার পেটে অনেক বিদ্যে, আমি জানি। মাত্র একতার পাকানো সুতো দিয়ে তুমি পৃথিবীর সব হাওয়া-বাতাসকে বেঁধে ফেলতে পার, তা কি আর আমি জানিনে ভেবেছ। সব জানি! কোনো সওদাগর যদি সেই সুতোর পয়লা পাক খোলে তা হলে তার পালে চমৎকার হাওয়া লাগবে, দ্বিতীয় পাক খুললে জোরে জোরে হাওয়া বইতে থাকবে। আর শেষের দুটো পাক খুললে এমন ঝড় বইতে থাকবে যে সাগর উথাল-পাথাল হবে, আদ্যিকালের বিরাট বিরাট গাছ উপড়ে নিয়ে সমুদ্রে আছাড় দিয়ে ফেলে দেবে। কেমন ঠিক বলি নি ঠাকমা? হুঁ, হুঁ, আমি আমি যে সব জানি! দাও-না ঠাকমা ওকে একটা মন্তর, যাতে গায়ে একশ পালোয়ানের জোর পায়। আর সেই জোরে তুষার রানিকে হারিয়ে, ফিরিয়ে আনবে ওর কয়কে।

শুনে ফিনল্যান্ডের ঠাকমা বলল, "একশ জনের জোর? উঁহু, কিছু লাভ হবে না তাতে।"

বলে, তাকের উপর থেকে পেড়ে আনল একটা বিরাট কাগজের পুটলি। তারপর, সেই পুটলি থেকে একতাড়া কাগজ বের করে মেঝের ওপর বিছিয়ে একমনে কী সব পড়তে লাগল ঠাকমা। কাগজের উপর আজব আজব হরফে লেখা যত রাজ্যের মন্তর।

পড়তে, পড়তে, পড়তে ঠাকমার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল। তবু ঠাকমার পড়া শেষ হয় না।

শেষ হয় না তো, হয়ই না।

কিন্তু হরিণটা জেরদার জন্যে এত মিনতি করতে লাগল আর জেরদাও এমন করুণ নয়নে কাঁদো কাঁদো মুখে তার দিকে তাকাতে লাগল যে শেষ পর্যন্ত ঠাকমার মনটা একেবারে গলে গেল।

তখন, ঠাকমা হরিণটাকে ঘরের এক কোণে ডেকে নিয়ে গিয়ে তার মাথায় আর এক চাপ বরফ দিয়ে কানে কানে বলল, "ছোট্ট খোকন কয় তুষারকন্যের কাছেই আছে। জায়গাটা কয়ের খুব ভালো লেগে গেছে। তুষারকন্যের মায়ায় কয় মুগ্ধ হয়ে আছে। ওর এখন মনে হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা জায়গা, তুষারকন্যের ওই রাজত্ব আর রাজপুরী। ভাঙা আয়নার টুকরোটার জন্যেই এ-সব ঘটতে পেরেছে। আয়নার একটা কণা ওর চোখের তারায় আর একটা কণা ওর কলজের সাথে এখনও আটকে আছে।

"যদ্দিন পর্যন্ত টুকরোগুলো অমনিভাবে লেগে থাকবে, তদ্দিন পর্যন্ত ওর মায়ার ঘোর কাটবে না—তুষারকন্যের বশ হয়ে থাকবে।"

"কিন্তু তুমি জেরদাকে কিছু একটা মন্তর শিখিয়ে দাও না, যাতে রানির চাইতেও ওর বেশি শক্তি হয়, রানির মায়া কাটিয়ে দিতে পারে।" হরিণ মিনতি করে বলল ঠাকমাকে।

ঠাকমা বললেন, "ওর নিজের যা শক্তি আছে তার চেয়ে বেশি শক্তি আমি কোথায় পাব! দেখছ-না কত বড় শক্তি ওর। মানুষ আর পশু সবাই ওর বশ, সবাই ওকে ভালোবাসে,

www.pathagar.com

মানে। এর চেয়ে বড় শক্তি আর আছে নাকি? ওর এই শক্তির আসল কারণ কী জানো? কারণ হচ্ছে, ও খুব ভালো আর খুব সুন্দর ছোট্ট খুকু!

"এখন ও যদি নিজেই তুষারকন্যের দেশে গিয়ে কয়ের চোখ আর কলজে থেকে মায়া আয়নার টুকরো দুটো বের করতে পারে, তবেই কয়কে ফিরে পাবে, নইলে আর কোনো আশা নেই। ও যদি নিজে না পারে তা হলে আমাদের দিয়ে আর কোনো আশা নেই।"

কথাগুলো বলে ঠাকমা হরিণকে তুষারকন্যের পুরীর পথ বলে দিল, "এখান থেকে সোজা দু মাইল গেলে তুষারকন্যের বাগান পাবে। বাগানের গোড়াতেই পাবে একটা লাল ফুলের ঝোপ। জেরদাকে পিঠে করে নিয়ে গিয়ে ঝোপটার পাশে নামিয়ে দিয়ে তুমি পা চালিয়ে আমার কাছে চলে আসবে। খবরদার, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আবার গপ্প জুড়ে দিয়ো না যেন।"

এই-না বলে, ঠাকমা জেরদাকে আবার তুলে দিল হরিণের পিঠে। আর, হরিণ, জেরদাকে নিয়ে ঝড়ের বেগে যেন উড়ে চলল তুষারকন্যের বাগানের দিকে।

"আমার জুতো! আমার দস্তানা! ওহ্, সব ফেলে এসেছি।" দারুণ শীতে আর্তনাদ করে উঠল জেরদা। কিন্তু হরিণটার আর থামতে, কি ফিরে যেতে সাহস হল না।

এক দৌড়ে এসে থামল, সেই লাল ফুলের ঝোপটার পাশে, যেটার কথা ঠাকমা বলে দিয়েছে। থেমে, জেরদাকে পিঠ থেকে নামিয়ে দিল। নামিয়ে আদর করে চুমো খেলো ওকে। মুক্তার মতো কয়েক ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ল ওর দু'গাল বেয়ে। চোখের জল মুছে, পেছন ফিরে, আর এক দৌড়ে ঠাকমার বাড়িতে ফিরে গেল।

আর, জেরদা ঠাণ্ডা, বরফ-ঢাকা ফিনল্যান্ডের খোলা মাঠে একা দাঁড়িয়ে রইল। জায়গাটায় গায়ের রক্ত-জমে-যাওয়া শীত। এই শীতে কিনা জেরদার না আছে জুতো, না আছে দস্তানা। কী যে এখন করবে, আর কোন পথে এগিয়ে যাবে জেরদা ভেবে পায় না। তারপরই হঠাৎ সামনের দিকে দৌড়ুতে লাগল সে।

দৌড়ুতে দৌড়ুতে গিয়ে পড়ল বিরাট একদল বরফের টুকরোর মাঝখানে। বরফগুলো কিন্তু মোটেও আকাশ থেকে পড়েনি। আকাশটা তখন দিব্যি পরিষ্কার, আর, উত্তুরে বাতির সারিটা উজ্জ্বল এক সার মালার মতো জ্বলছে। আসলে বরফের টুকরোগুলো তখন মাঠের মধ্যে ছুটোছুটি করছিল। বরফের টুকরোগুলো যতই কাছে এগিয়ে আসে ততই বড় হয়ে উঠতে থাকে। আসলে, বরফের এই টুকরোগুলো সব তুষারকন্যের সেপাই-শান্ত্রি। তাদের রানির পুরী পাহারা দিচ্ছে। কী অদ্ভুত গায়ের গড়ন এক-এক জনের। তাদের কাউকে দেখাচ্ছে কুৎসিৎ কাঁটাওয়ালা সজারুর মতো, কাউকে বেড়ি-পাকানো, ফণা-তোলা সাপের মতো আবার কাউকে-বা দেখাচ্ছে ঝাঁকড়া-চুলওলা মোটাসোটা ভাল্লুকের মতো। সবগুলোই চকচকে সাদা, জ্যান্ত বরফের টুকরো।

জেরদাকে দেখে তুষার রানির সেপাই-শান্ত্রি চারদিক থেকে ছুটে এসে ঘিরে ধরল।

জেরদা তখন আর কী করবে, আকাশের দিকে হাত তুলে প্রার্থনা করতে লাগল। জেরদা প্রার্থনা করে, আর, দারুণ ঠাণ্ডায় ওর মুখ দিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলির মতো নিশ্বাস বেরুতে থাকে। এই ভাবে জেরদা নিজের নিশ্বাসটাও দেখতে পায়।

www.pathagar.com

জেরদা দেখে, আর, প্রার্থনা করে।

আর, সেই নিশ্বাস, আরো ঘন হয়ে উঠতে উঠতে শেষ হয়ে যায় ডানাকাটা পরী। এমনি করে নিশ্বাস থেকে অনেকগুলো পরি তৈরি হয়ে গেল। পরিগুলো মাটি ছোঁয়ার সাথে সাথে হয়ে উঠল মস্তো বড়ো। তাদের হাতে ঢাল-তরোয়াল, মাথায় লোহার টুপি। জেরদা যতই প্রার্থনা করে চলে, পরীরাও ততই সংখ্যায় বাড়তে থাকে। বাড়তে, বাড়তে শেষে পরীদের বিরাট একটা বাহিনী দাঁড়িয়ে গেল ওর চারপাশ ঘিরে। তুষার রানির বরফের সেপাইগুলোকে দারুণ আঘাত করতে লাগল তারা। হাজার টুকরোয় খান খান হয়ে গেল রানির সেপাইগুলো।

এবার সাহসে ভর করে পরম নিশ্চিন্ত মনে এগিয়ে চলল জেরদা। ডানা-কাটা পরীরা আলগোছে চাপড়ে দিতে লাগল ওর হাত আর পা-গুলো। তাই জেরদার আর খুব বেশি শীত লাগল না। পা চালিয়ে এগিয়ে চলল তুষার রানির পুরীর দিকে।

সাত

তুষার রানির পুরীতে

তুষার রানির পুরী। বরফের তৈরি তার দেয়াল, আর দরজা জানালা, শার্সি—সব, ফুরফুরে হাওয়ায় তৈরি। শও মহলা পুরীর মহলের পর মহল শুধু তুষার দিয়ে তৈরি। তার মধ্যে সবচে বড় যে মহল, সেটা পার হতে যোজন পথ যেতে হয়। এত বড় সেই মহল।

চোখ-ধাঁধানো উত্তুরে আলোয় তুষারকন্যের শও মহলা পুরী উজাল!

আলোয় আলোয়—কন্যের পুরী দিনরাত ঝলোমলো। কিন্তু, হলে কী হয়। এই যে মস্তো ম-স্তো একশটা মহল, দিনরাত খাঁ খাঁ করে—কাকপক্ষী জনমনুষ্যের চিহ্নি নেই। চার দিকে শুধু চকচকে ঝকঝকে আলো ঠিকরে পড়ে।

তুষারকন্যের এমন যে পুরী, তাতে রাজ্যির শীত ঠাসা। সারাটা পুরী তুহিন হিম।

সেখানে আমোদ-আল্লাদের ছিটে-ফোঁটাও কেউ কোনোদিন দেখেনি। ভালুকনাচে আসর পর্যন্ত না। তেমন আসর বসলে ঝড়ের হাওয়ারা হয়তো গান গাইত আ: ভালুকগুলো পিছনের পায়ে ভর দিয়ে সুরের তালে তালে নাচতে পারত।

কিন্তু কোথায় কী—?

একটু যে লুকোচুরি কানামাছি খেলবে, তার জন্যেও কোথাও কেউ নেই। সাঁঝের বেলা শেয়াল-কন্যেদের চায়ের আসর কোনোদিন বসে না।

তুষার দেশের রানি—তুষারকন্যের শও মহলা পুরী তো পুরী নয়, নিঝুম পুরী—সব শুমশাম। সে পুরীতে শীতের রাজত্বি।

আর, সেই যে মস্তো মহল—

তার মধ্যিখানে রয়েছে এক হ্রদ। ঠাণ্ডায় জমে গিয়েছে হ্রদের জল। হাজার হাজার টুকরোয় ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছে। আর এমন মজার সব টুকরাগুলো ঠিক এক ছাঁচের এক ছাঁদের। মনে হয় যেন কোনো শিল্পী হাতে ধরে তুলির টানে টানে ওগুলো বানিয়েছে।

এরি মধ্যিখানে তুষারকন্যের সিংহাসন।

পুরীতে এলে এইখানেই বসে তুষারকন্যে। কন্যে এই হ্রদের নাম দিয়েছে 'যুক্তি-মুকুর'। কন্যে বলে, সারা পৃথিবীতে এমন আয়না নাকি আর দুটি নেই।

www.pathagar.com

সেই যে কয়, এই তুহিন পুরীতে ঠাণ্ডায় একেবারে কালী বরণ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কয় মায়ায় আচ্ছন্ন, শোদবোধ সব ওর নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তুষারকন্যে চুমু দিয়ে কয়ের গা থেকে সব শীত টেনে নিয়েছে।

আর শোদবোধ থাকবেই-বা কেন, কল্‌জেটা যে কয়ের জমে বরফ হয়ে গিয়েছে।

কয় একা একা বসে বরফের কতকগুলো পাতলা, চ্যাপ্টা টুকরো নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। নানানভাবে ওগুলো জোড়া লাগাচ্ছে—আবার ভেঙে ফেলছে। টুকরোগুলো দিয়ে কী যেন একটা বানাতে চায়।

বরফের টুকরোগুলো নিয়ে এক মনে খেলা করছে কয়। কয় মনে মনে ভাবে, এই ছকগুলোর মতো—আশ্চর্য আর সুন্দর কিছুই নেই।

হবে-না কেন?

কয়ের চোখে যে মায়া আয়নার সেই টুকরো তখনও লেগে রয়েছে। বরফের ছকগুলো দিয়ে সে একটা কথা বানাতে চায়, কিন্তু এত যে ভাঙছে-গড়ছে তা যদি কথাটা বানাতে পারে! 'অনাদি অনন্ত'—এই কথাটা বানাতে হবে। তুষারকন্যে বলেছে, 'ছক সাজিয়ে কথাটা যদি লিখতে পার, তবেই তোমার মুক্তি।'

কথাটা লিখতে পারলে তুষারকন্যে কয়কে একজোড়া নতুন স্কেট আর এই পৃথিবীটাও উপহার দেবে বলেছে।

তারপর তুষারকন্যে আবার চলে গেল। যাবার সময় কয়কে বলল, 'এবারে গরম দেশে যাচ্ছি।' বলে, তুষার দেশের রানি হাওয়ার ডানায় ভর করে উড়ে গেল। মাইলের পর মাইল লম্বা সেই ম-স্তো মহলটার মধ্যে কয় একা বরফের টুকরোগুলোর পানে এক ধ্যানে চেয়ে ভাবছে তো ভাবছেই, নড়ন নেই চড়ন নেই। চোখে তার পলক পড়ে না। দেখে মনে হয় যেন বরফের মতো জমে গেছে।

এমন সময়—

সেই ম-স্তো ফাঁকা মহলটার মধ্যে এসে ঢুকল ছোট্ট জেরদা। মহলের মধ্যে ঢুকেই তার চোখ পড়ল কয়ের ওপর। আর যেই-না দেখা ওমনি এক দৌড়ে কয়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর ওর গলা জড়িয়ে ধরে আদর করে কত কথা বলতে লাগল। কিন্তু কয়ের মুখে রা নেই। তেমনি চুপচাপ বসে রইল। শেষে আর জেরদা সইতে পারে না। দুঃখে ওর বুক ফাটে, চোখ বেয়ে জল উপচে পড়ে কান্নায়। আর সেই চোখের জল গড়িয়ে গিয়ে পড়ল কয়ের বুকে। তারপর বুক চুঁইয়ে গিয়ে কলজেয় লাগল সেই জল। আর অমনি ভেসে গেল কলজেয় আটকে থাকা মায়া আয়নার সেই টুকরোটা।

যেই-না মায়া আয়নার টুকরো ভেসে যাওয়া আর সঙ্গে সঙ্গে কয় জেরদার পানে চোখ তুলে চাইল। কয়কে চোখ তুলে চাইতে দেখে আনন্দে জেরদা তাদের প্রার্থনার সেই গানটা গেয়ে উঠল।

গান শুনে কয়ও কান্নায় ভেঙে পড়ল। কয় এমন কান্নাই কাঁদল যে, চোখের জলের সাথে বেরিয়ে এল আয়নার অপর টুক্‌রোটা, চোখের সাথে যেটা লেগে ছিল।

ওটা বেরিয়ে যেতেই কয় জেরদাকে চিনতে পারল। আনন্দে লাফিয়ে উঠল কয়। বলল, "জেরদা, জেরদা, এদ্দিন কোথায় ছিলে তুমি।" তারপর চারপাশে চেয়ে দেখে আশ্চর্য হয়ে বলল, "এ্যাঁ, এ আমি কোথায় এসেছি। ইস জায়গাটা কী ঠাণ্ডা। আর দেখ, জায়গা কী

www.pathagar.com

বিচ্ছিরি রকমের বড়, আর কেমন ফাঁকা।" তারপর আদর করে জেরদাকে জড়িয়ে ধরল। জেরদা আনন্দে একবার হাসে একবার কাঁদে।

ওরা এত খুশি হয়ে উঠল যে, সেই খুশির ছোঁয়ায় চারপাশের বরফগুলো আনন্দে নেচে উঠল। তারপর নাচতে—নাচতে—নাচতে ক্লান্ত হয়ে বরফের টুকরোগুলো বিশ্রামের জন্যে গা এলিয়ে দিল।

আর অমনি—কী আশ্চর্য!

টুকরোগুলো পর পর এমনভাবে শুয়ে পড়ল যে, ঠিক সেই কথাটা লেখা হয়ে গেল।

এক্ষুনি হয়তো তুষারকন্যে বাড়ি ফিরবে।

যে কথা লেখা হলে কয়ের মুক্তি মিলবে, ওই তো সেটা—চকচকে বরফের হরফে লেখা হয়ে পড়ে আছে। তবে আর ভাবনা কী?

কয় আর জেরদা হাত ধরাধরি করে তুষারকন্যের পুরী ছেড়ে বেরিয়ে এল। বাইরে এমন যে ঠাণ্ডা হাওয়া, ওরা বেরিয়ে আসতেই পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল, আর সুয্যি মামা উঁকি দিয়ে দেখতে লাগল। ওদের পথ আলোয় আলোয় ভরে গেল। চলতে চলতে এক সময় ওরা এসে পড়ল লাল ফুলের ঝোপটার পাশে। সেখানে সেই লম্বা শিংওলা বল্গা হরিণটা ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে। সাথে করে এনেছে তার টুকটুকে রাঙা বউ।

এতদূর হেঁটে এসে কয় আর জেরদার খুব খিদে পেয়েছে। বল্গা হরিণের রাঙা বউ শুকনো মুখ দেখে ওদের দুধ খাইয়ে দিল। তারপর দুজনাতে কয় আর জেরদাকে পিঠে নিয়ে ছুটতে লাগল।

আট

আমার কথাটি ফুরোল

ছুটতে ছুটতে প্রথমে এসে থামল ফিনল্যান্ডের ঠাকমার বাড়ি। ওদের দেখে ঠাকমার ফোকলা গালে হাসি আর ধরে না। আদর করে গরম ঘরে নিয়ে যায়—ঠাকমার গরম ঘরে গিয়ে ওরা দিব্যি চাঙা হয়ে উঠল।

ঠাকমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওরা আবার বেরিয়ে পড়ল। যাওয়ার সময় ঠাকমা ওদের দেশের পথের অনেক হদিস দিয়ে দিলেন। তারপর, সেখান থেকে কয় আর জেরদা এসে পৌঁছুল লাপল্যান্ডের দিদিমার বাড়ি। কয়কে নিয়ে জেরদা ফিরে এসেছে দেখে দিদিমা ভারি খুশি। তক্ষুনি ওদের নতুন পোশাক তৈরি করে দিলেন। পোশাক তৈরি হয়ে গেলে দিদিমা বসলেন ওদের স্লেজ গাড়িটা মেরামত করতে।

কয় আর জেরদা আবার পথে বেরিয়ে পড়ল। বল্গা হরিণ, হরিণের টুকটুকে রাঙা-বৌ আর দিদিমা ওদের একেবারে লাপল্যান্ডের শেষ সীমা পর্যন্ত এগিয়ে দিল। তখন সেখানে বসন্তের প্রথম সবুজ ঘাস দেখা দিয়েছে। ওখানে এসে তারা হরিণ, হরিণ-বৌ আর লাপল্যান্ডের দিদিমার কাছ থেকে বিদায় নিল।

"বিদায়!" বলল সবাই।

ওরা আবার পথ চলতে লাগল। বসন্তের হাওয়া বইছে চারদিকে। বনে বনে ফুলের মেলা। মাঠে মাঠে দেখা দিয়েছে সবুজ ঘাসের আস্তরণ। কিচিরমিচির করে গাইছে ছোট পাখিরা।

www.pathagar.com

চলতে চলতে ওরা এক বনের ধারে এসে পৌঁছল। আর ঠিক সেই সময় বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা ঘোড়া। ঘোড়ার পিঠে বসে আছে একটা মেয়ে। এগিয়ে আসতেই জেরদা চিনতে পারল, ডাকাতদের সেই ক্ষুদে মেয়েটা যেন। তাই তো, সেই ক্ষুদে মেয়েটাই তো, জেরদা ওকে এখানে দেখতে পেয়ে খুশি হয়ে উঠল।

ওদের দেখে মেয়েটা ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে একটা গাছের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। বাড়িতে বসে থেকে থেকে ঘেন্না ধরে গেছে দস্যি মেয়ের। তাই এখন সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর যত সব অচিন দেশ দেখতে বেরিয়ে পড়েছে। সবার আগে এসেছে উত্তরে। এখানে ভালো না লাগলে যাবে আর কোনো দেশে।

"তোমাকে বেশ লাগে কিন্তু দেখতে!" ছোট্ট কয়কে বলল দস্যি মেয়েটা।

জেরদা ওর চিবুক নেড়ে শুধোল রাজপুত্তুর আর রাজকন্যের কথা। জানতে চাইল কেমন আছে তারা।

"বিদেশে বেড়াতে গেছে," বলল ক্ষুদে ডাকু মেয়ে।

"আর কাকটা?" শুধোল জেরদা।

"মরে গেছে বেচারি!" বলল ডাকু মেয়ে। "তার বউটা বিধবা হয়ে এখন শুধু উড়ে বেড়ায় শোকে, পায়ে একটা কালো সুতো বেঁধে।

কাকটা মরে গেছে শুনে জেরদার ভারি দুঃখ হল। মুক্তোর মতো ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল ওর গাল বেয়ে। আহ, কী ভালোই–না বাসত ওকে কাকদাদা আর কাক বৌদি।

"কই, তোমার কথাটা তো এখনো শোনা হয়নি! কী করে কোথায় গিয়ে পেলে ওকে?" শুধোল ওকে ক্ষুদে ডাকু মেয়ে।

জেরদা আর কয় তাকে সব কথা খুলে বলল একে একে।

"একটুখানি গোলমাল, ঝকমারি, ফিসফাস।

তারপর সব কিছু ঠিকঠাক শেষমেস।"

পদ্যের মতো মিল দিয়ে বলে হাততালি দিয়ে হেসে উঠল ডাকু মেয়ে। তারপর ওদের দুজনার হাত ধরে বলল, ওদের দেশে গেলে কয় আর জেরদার সাথে দেখা করে আসবে।

বলে, ঘোড়ার পিঠে চেপে ডাকু মেয়ে আবার পথ চলল, ধুলো উড়িয়ে ছুটল তার ঘোড়া।

কয় আর জেরদাও আবার পথ চলে। চলতে চলতে একই সময় ওদের কানে এল গির্জের ঘণ্টা, আর, ওরাও চিনতে পারল উঁচু উঁচু পাহাড়ের সুঁচোল চুড়োগুলো আর তারই পাশে ওদের বিরাট শহরটা।

ওদের সেই শহর। শহরে পৌঁছে তারা ছুটল দিদিমার দোরগোড়ায়। সিঁড়িটা বেয়ে উপরে উঠল। উঠে, ঘরে ঢুকল। সব কিছু সেই আগের মতোই রয়েছে সেখানে। মস্তো বড়ো দেয়ালঘড়িটা তেমনি আগের মতো বেজে চলেছে। "টিক! টিক!" তার হাতের মতো কাঁটা দুটোও ঘুরে চলেছে তেমনি। কিন্তু বাড়ি এসে এ–ঘর, ও–ঘর ঘুরতে ঘুরতে লক্ষ করল, এখন বেশ বড় হয়েছে তারা।

ছাদের চিলেকোঠায় খোলা জানলাটার পাশে, গোলাপঝাড়টায় ফুটেছে অনেকগুলো ফুল। ঝাড়ের পাশে তেমনি পাতা রয়েছে তাদের আসন দুটো।

কয় আর জেরদা নিজের নিজের আসনে গিয়ে বসল। আলো ঝলমলে রোদে গা মেলে দিদিমা তখন বাইবেল পড়ছিলেন।

কারো মুখে কথা নেই। শুধু গাছে গাছে ফুলেরা দুলে উঠে খেলা করে হাওয়ার সাথে।

www.pathagar.com

ছোট্ট জলকন্যা

মস্ত বড়ো সমুদ্রের মধ্যে অনেক, অনেক দূরে জল যেখানে অপরাজিতার মতো নীল আর স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ, যেখানটা এতই গভীর যে হাজারটি উঁচু-চূড়া মন্দির পর-পর সাজালে তবে উপর থেকে একেবারে তলায় গিয়ে ঠেকে—সেখানে সাগর রাজার দেশ।

তোমরা বুঝি ভেবেছিলে জলের নিচে বালি ছাড়া কিছু নেই? তা নয়, মোটেই তা নয়। আশ্চর্য সুন্দর সেখানকার গাছপালা, এত হালকা তার ডালপালা যে জল একটু কেঁপে উঠল কি তারা নেচে উঠল শিরশিরিয়ে—হঠাৎ দেখলে তাদের জীবন্তই মনে হয়। ডালের ফাঁক দিয়ে-দিয়ে কত রকমের ছোট-বড়ো মাছ ছুটোছুটি করে বেড়ায়—ঠিক যেমন আমাদের গাছে-গাছে ওড়ে পাখির ঝাঁক।

জল যেখানে সবচেয়ে গভীর সেখানে সাগর-রাজার প্রাসাদ। দেয়ালগুলো তার এ-কালের, উঁচু জানলাগুলো পান্না-বসানো, আর শঙ্খের কাজ-করা ঢেউ-খেলানো ছাদ ঢেউয়ের দোলায়-দোলায় এই খুলছে, এই বুজছে। কী যে সুন্দর হয় দেখতে, প্রতিটি শঙ্খের বুকে ঝকঝকে উজ্জ্বল একটি মুক্তো, তার যে-কোনো একটি পেলে উপরকার দেশের যে-কোনো রাজা ধন্য হয়ে যায়।

সাগর-রাজার স্ত্রী মারা গেছেন অনেকদিন, তাঁর বুড়ি-মা ঘরসংসার দেখেন। এই বুড়ির বুদ্ধিসুদ্ধি নেহাৎ মন্দ নয়, কিন্তু সাগরসমাজে তাঁরাই যে সবচেয়ে বড়ো ঘর, এ নিয়ে বেজায় দেমাক তাঁর। তাঁর লেজে কিনা বারোটা ঝিনুক বসানো, সেটাই বড়ো ঘরের মার্কা, অন্যদের বড়জোর ছটা। এ ছাড়া তাঁর আর সবই ভালো, সবার মুখেই তাঁর সুখ্যাতি। রাজার ছয় মেয়ে,

www.pathagar.com

ছটি ফুটফুটে ছোট্ট রাজকন্যা। বুড়ি তাঁর নাতনিদের প্রাণের চেয়েও ভালোবাসেন। সবাই সুন্দর তারা, সবচেয়ে সুন্দর একেবারে ছোট্টটি। তার গায়ের রং গোলাপের পাপড়ির মতো তেমন নরম, সমুদ্রের মতো নীল তার চোখ; অবিশ্যি অন্য সব জলকন্যার মতো তারও পা নেই, পায়ের দিকটায় মাছের মতো লম্বা লেজ—তা কী কোমল আর কত উজ্জ্বল!

সমস্ত দিন মেয়েরা প্রাসাদের বড়ো-বড়ো ঘরে খেলা করে; সেখানে চারদিকের দেয়ালে ফোটে নানারঙের নানারকমের সুন্দর ফুল। পান্নার জানলাগুলো একটু খুলেছ কি মাছেরা সাঁতরে এল ঘরে, যেমন আমাদের জানলা দিয়ে চড়ুইপাখি উড়ে আসে। কিন্তু মাছেদের সাহস চড়ুইপাখির চেয়ে অনেক বেশি, তারা সোজা রাজকন্যার কাছে এসে গা ঘেঁষে খেলা করে, খায় তাদের হাত থেকে, আদর করলে আর যেতেই চায় না, গায়ের সঙ্গে লেগে ঘুরে বেড়ায়।

প্রাসাদের সামনে মস্ত বাগান ভরে গাছের সারি, কোনোটা আগুনের মতো লাল, কোনোটা মেঘের মতো ঘন-নীল, গাছের ফল সোনালি রঙে ঝলোমলো, জ্বলন্ত সূর্যের মতো উজ্জ্বল গাছের ফুল। আমাদের বাগান হয় মাটিতে; ওখানের বাগান বালিতে, উজ্জ্বল নীল রঙের বালি, গন্ধক-জ্বলা আগুনের মতো নীল। সমস্তটার উপরে অদ্ভুত সুন্দর একটা নীল রঙের ছোপ; সেখানে গেলে মনে হবে যেন অনেক উঁচুতে উঠে গেছি, আকাশ মাথার উপরে, আকাশ পায়ের নিচে; সমুদ্রের তলায় যে আছি তা মনেই হবে না। জল যখন শান্ত, তখন সূর্য তাকিয়ে থাকে যেন বেগুনি রঙের একটা প্রকাণ্ড ফুল, তার ভরা পেয়ালা থেকে পৃথিবীর সমস্ত আলো যেন উপচে পড়ছে।

বাগানের এক-এক অংশ এক-এক রাজকন্যার দখলে; সেখানে তারা যার যা খুশি করে। একজন তার বাগান সাজিয়েছে তিমির চেহারা করে; আর একজনেরটা ঠিক জলকন্যার মতো; কিন্তু সবচেয়ে ছোট কন্যার যেটা, সেটা একেবারে সূর্যের মতো গোল; আর সূর্যটা তার চোখে কিনা লাল দেখাত—সেইজন্যে তার ফুলগুলোও সব টকটকে লাল রঙের। এই মেয়েটি কিছু অদ্ভুত গোছের, ভারি চুপচাপ, একা বসে-বসে কী যেন ভাবে। হয়তো একদিন উপরে এক জাহাজ ডুবেছে : তার নানারকম রংচঙে সুন্দর জিনিস নিয়ে মেতেছে তার বোনেরা, কিন্তু শিশু-কোলে-করা শ্বেতপাথরের একটি বালক-মূর্তি ছাড়া আর-কিছু এই মেয়ে চায় না। মূর্তিটি নিয়ে সে তার বাগানে রাখল, রোপণ করল তার পাশে একটি লাল ফুলের গাছ। গাছটি তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠল, তার লম্বা ডাল নুয়ে পড়ল মাটির উপর—সেখানে চির-চঞ্চল বেগুনি রঙের ছায়ায় যেন ডালে-মূলে জড়াজড়ি।

এই জলকন্যা সবচেয়ে ভালোবাসত মানুষদের কথা শুনতে, সমুদ্রের উপরে যাদের দেশ। ঠানদিকে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে সব গল্প শুনত সে—জাহাজের আর মানুষের আর ডাঙার প্রাণীর যত গল্প তিনি জানতেন, সব। ওখানকার ফুলে নাকি গন্ধ আছে—কী ভালো লাগত তার এ-কথা শুনে, তাদের সমুদ্রের ফুলগুলো সব তো গন্ধহীন—ওখানকার বনের রঙ সবুজ, আর তার ডালপালায় মাছ যত ছুটে-ছুটে বেড়ায় সব নানা রঙের, আর কী মিষ্টি গলায় গান করে তারা! ঠানদির মনে ছিল অবিশ্যি পাখিদের কথা, কিন্তু বলবার সময় মাছই বলেছিলেন : নাতনিরা-তো আর কখনো পাখি দেখেনি, বললে কি কিছুই বুঝত তারা?

www.pathagar.com

গল্প শেষ করে ঠানদি বলতেন, 'তোমাদের যখন পনেরো বছর বয়েস হবে তখন তোমরা উঠতে পারবে সমুদ্রের উপরে; পাহাড়ের ফাঁকে বসে থাকবে চাঁদের আলোয়, দেখবে জাহাজ যাচ্ছে, বুঝবে কাকে বলে শহর, আর কাকে বলে মানুষ।'

পরের বছর সবচেয়ে বড়োটির পনের হল। আর আর বোনেরা—আহা বেচারারা! মেজোটি বড়োটির এক বছরের ছোট, সেজোটির মেজোর ছোট এক বছরের, এমনি ক'রে-করে সবচেয়ে ছোটটির কপালে আরো পাঁচ-পাঁচ বছর বসে থাকা! তখন আসবে সেই শুভদিন—সে-ও উঠতে পারবে সমুদ্রের উপরে, দেখতে পারবে উপরকার পৃথিবীর সব কাণ্ড। যা-ই হোক বড়োটির যখন যাবার সময় হল সে কথা দিল, ফিরে এসে বোনদের কাছে সব গল্প বলবে; বুড়ো ঠানদি বিশেষ কিছু বলতেই পারেন না, আর তারা যে কত জানতে চায় তার তো অন্তই নেই।

কিন্তু ছেলেবয়েসের এই বাধা থেকে ছাড়া পাবার আগ্রহ সবচেয়ে ছোটটির মতো আর কারুরই তেমন তীব্র নয়। সবচেয়ে বেশি দেরি তারই—আর চুপচাপ একা বসে কী ভাববে সে? কত রাত খোলা জানলা দিয়ে স্বচ্ছ নীল জলের দিকে সে তাকিয়ে রয়েছে, চারদিকে মাছেরা ছুটোছুটি করে খেলা করছে, দেখেছে সে সূর্য আর চাঁদ, ম্লান তাদের আলো; উপরে কেমন দেখায়—তার চেয়ে হয়তো অনেকটা বড়ো, অনেকটা উজ্জ্বল। যদি হঠাৎ কালো ছায়া পড়েছে—একটা তিমি বুঝি, না কি মানুষে বোঝাই একটা জাহাজ ভেসে চলে গেল। সে-সব মানুষ স্বপ্নেও ভাবলে না যে তাদের অনেক, অনেক দিনের ছোট এক জলকন্যা জাহাজের হালের দিকে ব্যাকুল আগ্রহে দিয়েছে লম্বা হাত দুটো বাড়িয়ে।

তারপর সেই দিন এল। বড়ো মেয়েটির বয়েস হল পনেরো, উঠল সে সমুদ্রের উপরে।

ওঃ, ফিরে এসে তার হাজার গল্প! সবচেয়ে ভালো লেগেছে তার চাঁদের আলোয় বালির উপর বসে মস্ত শহরটার দিকে তাকিয়ে থাকতে, সেখানে তারার মতো ঝিলিমিলি কত আলো আর কত গানবাজনা। দূর থেকে সে শুনেছে মানুষের আর গাড়ির শব্দ, দেখেছে মন্দিরের উঁচু চুড়ো, শুনেছে ঘণ্টার শব্দ; আর ওখানে যেতে পারবে না বলেও ও-সব জিনিসের জন্যে তার আরো বেশি মন-কেমন করছে।

এ-সব গল্প শুনতে-শুনতে ছোটটির নিঃশ্বাস পড়ে না। এর পর রাত্রে তার খোলা জানলায় যখন সে দাঁড়ায়, জলের ভিতর দিয়ে উপরে তাকিয়ে সে সেই বিরাট শব্দময় শহরের কথা ভাবতে-ভাবতে এমন তন্ময় হয়ে যায় যে তার মনে হয় সে বুঝি মন্দিরের ঘণ্টার শব্দ শুনতে পাচ্ছে।

পরের বছর দ্বিতীয় বোনটি পেল ছাড়া। সে যখন ভেসে উঠল সমুদ্রের উপর সূর্য তখন অস্ত যায়-যায়; আর তা দেখে এত ভালো লাগল তার যে সে ফিরে এসে বলল, জলের উপরে যা কিছু তার চোখে পড়েছে, এত সুন্দর আর কিছুই নয়।

'সমস্ত আকাশ একেবারে সোনায় সোনা' সে ফিরে এসে বলল। 'আর মেঘগুলো কী যে সুন্দর তা আমি বলে দেখাতে পারব না—এই লাল, এই বেগুনি, এই কাজল-কালো, ভেসে মিলিয়ে গেল আমার মাথার উপর দিয়ে। কিন্তু আরো তাড়াতাড়ি উড়ে এল জলের উপর দিয়ে এক ঝাঁক সাদা রাজহাঁস, ঠিক যেখানে সূর্য নেমে এসেছে। আমি তাকিয়ে রইলুম তাদের দিকে, সূর্য অস্ত গেল; সমুদ্রের ঢেউয়ে-ঢেউয়ে আর মেঘের ধারে-ধারে যে-গোলাপি আভা, তা-ও গেল আস্তে-আস্তে মিলিয়ে।

তৃতীয় বোনের উপরে যাবার সময় হল। সবচেয়ে বেশি সাহস তারই, সে চলল এক নদীর স্রোত ধারে-ধারে। নদীর দুধারে ছোট ছোট সবুজ পাহাড়; সেখানে গাছ-পালা,

www.pathagar.com

সেখানে আঙুর-খেত, ফাঁকে-ফাঁকে ঘর, বাড়ি, প্রাসাদ। সে শুনল পাখির গান; আর সূর্যের তাপে তার মুখ প্রায় পুড়ে গেল, থেকে-থেকে তাই তাকে জলে ডুব দিয়ে নিতে হল। এক জায়গায় একদল ছেলে-মেয়ে লাফালাফি করে স্নান করছে; তার খুব ইচ্ছে হল ওদের সঙ্গে গিয়ে খেলে, কিন্তু ওরা ছুটে পালাল বিষম ভয় পেয়ে, আর ছোট কালো একটা জানোয়ার তাকে দেখে এমন ঘেউ-ঘেউ করতে লাগল যে অগত্যা সে-ও ভয় পেয়ে ফিরে এল সমুদ্রে। তবু সে ভুলতে পারে না সেই সবুজ বন, আর নীলায়িত পাহাড়; আর ফুটফুটে ছেলে-মেয়েরাই-বা কী, পাখনা নেই, তবু কেমন নির্ভয়ে নদীতে সাঁতরে বেড়ায়!

চতুর্থ বোনটির অত সাহস হল না, সে খোলা সমুদ্রেই রইল; ফিরে এসে বলল, অত সুন্দর আর কিছুই হতে পারে না। শাদা-পাল-তোলা জাহাজ দূর দিয়ে ভেসে গেছে,—এত দূরে যে মনে হয়েছে যেন এক ঝাঁক গাংচিল; জলে খেলা করছে ফূর্তিবাজ শুশুকের দল; বিরাট তিমি এক নিশ্বাসে হাজারটা ফোয়ারা তুলে দিয়েছে আকাশে।

পরের বছর পঞ্চম বোনটির পনেরো বছর হল। তার জন্মদিন পড়ল শীতকালে; সমুদ্রের তখন সবুজ রঙ, প্রকাণ্ড সব বরফের পাহাড় জলে ভাসছে। সে বলল সেগুলো মুক্তোর মতো শাদা দেখতে—অবিশ্যি মানুষের দেশের মন্দিরগুলোর চেয়ে ঢের বেশি বড়ো। এরই এক পাহাড়ের চূড়োয় বসে সে বাতাসে তার চুল দিলে খুলে, জাহাজগুলো তাড়াতাড়ি পাল তুলে দিয়ে যত শিগ্‌গির পারল ছুটে পালাল।

সন্ধেবেলায় সমস্তটা আকাশ পালে-পালে ভরে গেল; বরফের বিরাট পাহাড়গুলো এই উঠছে, এই ডুবছে, নীল-লালচে একটা আভায় উঠেছে ঝিকঝিকিয়ে; আর মেঘ চিরে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল, গুম্‌গুম্ করে বাজের আওয়াজ চলল গড়িয়ে। তক্ষুনি নামানো হল সব জাহাজের পাল, সবাই সেখানে ভয়ে জড়োসড়ো; শুধু রাজকন্যা চুপচাপ বসে আঁকাবাঁকা বিদ্যুতের দিকে শান্তচোখে তাকিয়ে রইল।

এরা সকলেই প্রথমবার উঠে নানারকম নতুন সুন্দর জিনিস দেখে গেল মুগ্ধ হয়ে, কিন্তু সে নতুনের মোহ শিগ্‌গিরই কেটে গেল। কিছুদিনের মধ্যেই উপরের পৃথিবীর চাইতে নিজের বাড়িই তাদের ভালো লাগতে আরম্ভ করল—আর কোথাও কি সবকিছু এমন মনের মতো পাওয়া যায়?

প্রায়ই সন্ধেবেলায় পাঁচ বোন হাতে হাত রেখে গভীর জল থেকে উঠে আসত। অপরূপ তাদের কণ্ঠস্বর, অমন কোনো মানুষের হয় না। ঝড়ের আগে আগে জাহাজের সামনে দিয়ে তারা যেত সাঁতরে—গান গাইত কী মধুর, কী অপরূপ মধুর সুরে! সে-গান যেন বলত,—জলের নিচে আমাদের কী যে আনন্দ তা কি দেখবে না ওগো নাবিক, ভয় করো না; এস, নিচে নেমে এস আমাদের কাছে।

নাবিকরা অবিশ্যি সে-কথা বুঝতে পারত না; তারা ভাবত এ শব্দ বুঝি শুধু জলের শিস, এমনি করে তারা সমুদ্রের লুকানো ঐশ্বর্য ছড়িয়ে আসত; কেননা জাহাজ ডুবলে সবাই তো মরবে, আর মৃত মানুষ ছাড়া সাগর-রাজের প্রাসাদে কেউ কখনো ঢোকেনি।

পাঁচ বোন যখন সন্ধেবেলায় সাঁতরে বেড়াচ্ছে, ছোটটি বসে আছে তার বাপের প্রাসাদে, একা স্তব্ধ হয়ে মুখ উঁচু করে তাকিয়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে তার, কিন্তু জলকন্যারা তো কাঁদতে পারে না; সেইজন্যে, তাদের যখন মন খারাপ হয়, মানুষের মেয়েদের চাইতে কত বেশি যে কষ্ট পায় তারা, তার অন্ত নেই।

www.pathagar.com

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে ভাবে, 'কবে হবে আমার পনেরো বছর ! আমি ঠিক জানি, উপরের পৃথিবী আর সেখানকার মানুষদের খুবই ভালো লাগবে আমার।'

শেষ পর্যন্ত এত আশার সেই সময় এল।

ঠানদি বললেন, 'নে, এবার তোর পালা। আয় তোকে তোর বোনেদের মতো করে সাজিয়ে দিই,' বলে তিনি তার চুলে জড়ালেন সাদা শাপলার মালা, আধখানা মুক্তো দিয়ে তৈরি তার এক-একটা পাপড়ি; তারপর আটটা বড়ো-বড়ো ঝিনুককে হুকুম করলেন তার লেজের সঙ্গে লাগতে—তাতে বোঝা যাবে সে কত বড়ো ঘরের মেয়ে।

'বড়ো অসুবিধে লাগে এতে', ছোট্ট রাজকন্যা আপত্তি করল।

'সুন্দর দেখাতে হল এক-আধটু অসুবিধে গায়ে না মাখলে চলে না ভাই', ঠানদি হেসে বললেন।

এত জাঁক-জমক কিন্তু রাজকন্যার বড়ো পছন্দ হল না; মাথার ভারি মুকুটটা বদলে তার বাগানের লাল ফুল পরতে পারলে সে খুশি হত, তাতে তাকে মানাতও ঢের ভালো। কিন্তু সে সাহস পেল না; ঠানদির কাছে বিদায় নিয়ে সমুদ্রের উপর ভেসে উঠল সে, ফেনার মতো হালকা।

যখন জলের উপর জীবনে প্রথম সে দেখা দিল, সূর্য ঠিক দিগন্তে নেমে গেছে। মেঘেরা জ্বলছে লাল-সোনালি আলোয়, সন্ধ্যাতারা ফুটেছে পশ্চিমের আকাশে, ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে, আর সমুদ্রটা মস্ত একটা আয়নার মতো নিশ্চল পড়ে। তিনটে মাস্তুলওলা এক জাহাজ ঠাণ্ডা জলের উপর চুপ করে শুয়ে; একটি পাল শুধু তুলে দেয়া, সেটাও কিন্তু নড়ছে না, হাওয়ার বেশি জোর নেই। নাবিকেরা সিঁড়িতে চুপচাপ বসে। ডেক থেকে আসছে গান-বাজনার শব্দ। তারপর অন্ধকার হল, হঠাৎ একসঙ্গে হাজার আলো জ্বলে উঠল, জাহাজে উড়ল অগুনতি নিশান।

ছোটো জলকন্যা কাপ্তেনের ঘরের কাছে গেল সাঁতরে। জাহাজটা জলের দোলানির সঙ্গে সঙ্গে আস্তে ওঠা-নামা করছে, একবার সে উঁকি মেরে কাচের জানলা দিয়ে তাকাল। ভিতরে অনেক জমকালো পোশাক-পরা মানুষ; তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর এক রাজপুত্র। খুব অল্প বয়েস তার, বড়ো জোর ষোলো; বড়ো-বড়ো কালো তার চোখ। তারই জন্মদিনের উৎসব আজ। নাবিকেরা ডেকের উপর নাচছে, আর রাজপুত্র তাদের সামনে বেরিয়ে আসতেই একশো হাউই আকাশে লাফিয়ে উঠল, রাত হয়ে গেল দিন। জলকন্যা তাতে এতই ভয় পেলে যে খানিকক্ষণ সে চুপ করে রইল জলে ডুবে।

আবার যখন সে তার ছোট মাথাটি তুলল, তার মনে হল যেন আকাশের সব তারা তার গায়ের উপর ঝরে পড়ছে। এমন অগ্নিবর্ষণ সে আর কখনো দেখেনি; সে কখনো শোনেওনি এমন আশ্চর্য ক্ষমতা মানুষের আছে ! তাকে ঘিরে ঘুরছে যেন বড়ো বড়ো সূর্য, বাতাসে সাঁতরে বেড়াচ্ছে জলজলে মাছ, আর সমুদ্রের শান্ত জলে পড়ছে তার পরিষ্কার ছায়া। জাহাজে এত আলো যে স্পষ্ট সব দেখা যায়। কী সুখী এই রাজপুত্র, কী সুখী ! সে নাবিকদের অভিনন্দন গ্রহণ করল, একটু হাসি-ঠাট্টা করল তাদের সঙ্গে, এদিকে গানের মধুর সুরগুলো রাত্রির নীরবতায় গেল মিলিয়ে।

রাত বাড়ল; কিন্তু এই জাহাজ আর এই সুন্দর রাজপুত্রকে ছেড়ে সে যেন কিছুতেই নড়তে পারছে না। ঢেউয়ের দোলা-লাগা কেবিনের ফুটো দিয়ে সে তাকিয়েই রইল। নিচে জল ফেনিয়ে উঠছে, জাহাজ বুঝি ছাড়ল। ওই তো তুলে দিয়েছে পাল, উঁচু হয়ে উঠছে ঢেউ, মোটা-মোটা মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল, দূর থেকে শোনা গেল বাজের আওয়াজ।

www.pathagar.com

নাবিকেরা যেই দেখতে পেল ঝড় আসছে, অমনি তারা আবার পাল দিল নামিয়ে। ঝড়ের সমুদ্রে মস্ত জাহাজটা হালকা এতটুকু নৌকোর মতো দুলছিল; ঢেউগুলো অসম্ভব উঁচু হয়ে জাহাজের উপর দিয়ে গেল গড়িয়ে—একবার সে নিচে ডুবে যায়, একবার সে মাথা তুলে ওঠে।

এ-সব ব্যাপারে জলকন্যার অবিশ্যি খুবই মজা লাগল, কিন্তু নাবিকদের সবাই একেবারে ভয়ে জড়োসড়ো। জাহাজ গেল ফেটে, মোটা মাস্তুলগুলো ঢেউয়ের দাপটে পড়ল নুয়ে, জোরে জল ঢুকতে লাগল। জাহাজ একটুখানি এদিক-ওদিক দুলল, তারপর বড়ো মাস্তুলটা বাঁশের কঞ্চির মতো গেল ভেঙে; জাহাজ উল্টিয়ে গিয়ে জলে ভরে উঠল। জলকন্যা এতক্ষণে নাবিকদের বিপদ বুঝতে পারল; কেননা ভাঙা জাহাজের মোটা-মোটা কাঠ ঢেউয়ে-ঢেউয়ে ভেসে পাছে তার গায়েই লাগে, সেজন্যে তাকে সাবধানও হতে হল।

কিন্তু ঠিক তখনই একেবারে ঘুটঘুট্টি অন্ধকার হয়ে এল, চোখে আর কিছু দেখা যায় না। একটু পরেই ভয়ংকর এক বিদ্যুতের চমকে সে সমস্তটা ভাঙা জাহাজ দেখতে পেল। জাহাজ যেন তলিয়ে গেল জলের নিচে—তার চোখ খুঁজল রাজপুত্রকে। প্রথমটা সে খুশিই হল; ভাবলে, এখনত সে আমার বাড়িতেই আসবে। কিন্তু একটু পরেই তার মনে পড়ল যে জলের নিচে তো মানুষ বাঁচে না; কাজেকাজেই রাজপুত্র যদি-বা কখনো তার প্রাসাদে ঢোকে, ঢুকবে মৃত মানুষ হয়েই।

'না না, রাজপুত্র মরবে না, মরবে না !' নিজের বিপদের কথা ভুলে ভাঙাচোরা টুকরোর ভিতর দিয়ে সে সাঁতরে গেল, শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেল রাজপুত্রকে। সে একেবারে তখন অবসন্ন হয়ে পড়েছে, অতি কষ্টে জলের উপর রেখেছে মাথা তুলে। হাত-পা ছেড়ে দিয়ে সে চোখ বুজে ছিল—নিশ্চয়ই ডুবে মরত যদি-না ঠিক সেই মুহূর্তে জলকন্যা এসে তাকে বাঁচাত। সে তাকে দুহাতে জলের উপর তুলে ধরল, স্রোতে ভেসে চলল দুজনে।

সকালের দিকে ঝড় ঠাণ্ডা হল, কিন্তু জাহাজটার কোনো চিহ্নই পাওয়া গেল না। সমুদ্রের ভিতর থেকে সূর্য উঠল আগুনের মতো, তার আলোয় রাজপুত্রের গালের আভা ফিরে এল যেন। কিন্তু চোখ তার তখনো বোজা। রাজকন্যা তার উঁচু কপালে চুমু খেল, ভিজে চুল সরিয়ে দিল মুখ থেকে। সে যেন তার বাগানের শ্বেতপাথরের মূর্তির মতোই দেখতে। সে আর-একবার চুমু খেয়ে মনে মনে প্রার্থনা করল রাজপুত্র শিগগির যেন ভালো হয়ে ওঠে।

তারপর সে দেখতে পেল শুকনো ডাঙা, পাহাড়গুলো বরফে চিকচিক করছে। পাড়ের ধার দিয়ে-দিয়ে চলেছে সবুজ বন, আর বনে ঢোকবার মুখে একটা মঠ কি মন্দির—কী যে ঠিক বোঝা গেল না। ঢোকবার পথটির দুধারে সারি-সারি খেজুর, পাশের বাগানে লেবুগাছের ভিড়। এখানে ছোটো একটি উপসাগর, জল গভীর হলেও খুব শান্ত, পাহাড়ের নিচে শুকনো শক্ত বালি। এখানে ভেসে এসে লাগল জলকন্যা। মরো-মরো রাজপুত্রকে নিয়ে, মাথা উঁচু করে তাকে শোয়াল গরম বালুতে, সূর্যের দিকে ফেরাল তার মুখ।

মন্দিরে ঘণ্টা বাজল ঢং ঢং করে, একদল মেয়ে বাগানে বেরিয়ে এল বেড়াতে। জলকন্যা তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে কতগুলো পাথরের পিছনে লুকোল, ফেনায় ঢাকল মাথা, তাতে তার ছোট মুখটি কেউ আর দেখতেই পেল না। কিন্তু আড়ালে থেকে সে চোখ রাখল রাজপুত্রেরই ওপর।

www.pathagar.com

একটু পরেই একজন মেয়ে এগিয়ে এল। রাজপুত্রকে দেখে সে যেন ভয় পেয়েই গেল, সে মনে করল ও মরে গেছে। নিজেকে সামলে নিয়ে সে ছুটে গিয়ে তার বোনদের ডেকে আনল। জলকন্যা দেখল, রাজপুত্র তাজা হয়ে উঠেছে, মেয়েরা সব তার মুখের উপর মুখ নিচু করে হাসছে। কিন্তু রাজপুত্র চোখ মেলে অবিশ্যি তাকে খুঁজল না, সে তো আর জানে না কে তাকে বাঁচিয়েছে! আর তাকে যখন মন্দিরের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হল, এত খারাপ লাগল জলকন্যার মন যে তৎক্ষণাৎ ঝুপ করে জলে ডুব দিয়ে ফিরে গেল তার বাপের প্রাসাদে।

ফিরে এসে সে যেন আগের চেয়েও বেশি শান্ত, বেশি চুপ-চাপ হয়ে গেল। বোনেরা জিজ্ঞেস করলে সে উপরের পৃথিবীতে কী-কী দেখে এল, কোনো জবাব দিল না সে।

যেখানে রাজপুত্রকে রেখে এসেছিল সেখানে কত সন্ধ্যায় সে গিয়ে উঠত। সে দেখত পাহাড়ের বরফ গলছে, বাগানে পেকে উঠছে ফল; কিন্তু রাজপুত্রকে কখনো দেখত না, ফিরে যেত ম্লান মুখে সমুদ্রের তলায়। বাগানে বসে-বসে রাজপুত্রের মতো সেই পাথরের মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকা হয়ে উঠল তার একমাত্র আনন্দ। ফুলগুলোর জন্যে তার আর মমতা নেই; বিপুল প্রচুরতায় বেড়ে উঠে তারা সিঁড়িগুলো ছেয়ে ফেলল, তাদের লম্বা-লম্বা লতাগুলো গাছের ডালে ডালে এমন করে জড়িয়ে ফেলল যে সমস্ত বাগান যেন একটি কুঞ্জবন হয়ে গেল।

তারপর আর সে তার মনের দুঃখ চেপে রাখতে পারল না। বলে গোপন কথাটা এক বোনকে, সে বলল অন্য বোনেদের, তারা বলল তাদের কোনো-কোনো বন্ধুকে। তাদের মধ্যে এক জলকন্যা রাজপুত্রের কথা শুনেই বুঝতে পারল,—জাহাজের উৎসব সে দেখেছিল নিজের চোখে; রাজপুত্র কোন্ দেশের, কে সেখানকার রাজা, সব জানা ছিল তার।

'আয় বোন,' বলে জলকন্যারা তাকে জড়িয়ে ধরল। একসঙ্গে হাতে হাত ধরে তারা ভেসে উঠল ঠিক সেই রাজপুত্রের প্রাসাদের সামনে।

ঝকমকে হলদে পাথরের প্রাসাদ, শ্বেতপাথরের উঁচু সিঁড়ির ধাপ সোজা সমুদ্র থেকে উঠে গেছে। মাথায় সোনার গম্বুজ; বিরাট থামগুলোর ফাঁকে-ফাঁকে শ্বেতপাথরের মূর্তিগুলো হঠাৎ দেখলে সত্যিকারের মানুষ বলেই মনে হয়। উঁচু জানলাগুলোর পরিষ্কার কাচের ভিতর দিয়ে দেখা যায় মখমলের পরদা-ঝোলানো শিলার ঘর, দেয়ালে জমকালো ছবি। সাগর-রাজার মেয়েদের পক্ষে এমন অপরূপ দৃশ্য দেখা মস্ত একটা ফুর্তির ব্যাপার; সবচেয়ে বড়ো একটা ঘরের জানলা দিয়ে তাকিয়ে তারা দেখল মাঝখানে এক ফোয়ারা খেলছে, তার জল উঠছে ছিটিয়ে উপরের ঝকমকে গম্বুজ পর্যন্ত; ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো ঝিলকিয়ে পড়ে নাচছে জলে, চিকচিক করছে চারদিকের সুন্দর গাছপালা।

এখন জলকন্যা জানল কোথায় থাকে তার প্রিয় রাজপুত্র; এখন থেকে প্রায় রোজ সন্ধ্যায় সে সেখানে যায়। সাহস করে বাড়ির যতটা কাছাকাছি সে যায়, অতটা যায় না আর-কোনো বোন; শ্বেতপাথরের বারান্দার তলা দিয়ে যে-ছোটো খাল গেছে, একদিন সে তা দিয়েও সাঁতরে গেল খানিকটা। এখানে, উজ্জ্বল জোছনার রাত্রে বসে-বসে সে রাজপুত্রকে দেখে, রাজপুত্র তো তাকে দেখতে পায় না, সে জানে নিজে সে একা-একা আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

কখনো রাজপুত্র বেড়াতে বেরোয় রঙ-করা শৌখিন নৌকোয়, উপরে ওড়ে নানারঙের নিশান। জলকন্যা লুকিয়ে থাকে পাড়ের সবুজ বাঁশ-বনে, কান পেতে শোনে তার কথা;

www.pathagar.com

তার রুপোলি ঘোমটা মাঝে মাঝে হালকা হাওয়ায় উড়ে যায়, তার খসখসানি নৌকোর কেউ যদি শোনে, মনে করে বুঝি একটা হাঁসের ডানা-ঝাপটানি কেঁপে গেল।

কোনো-কোনো রাত্রে জেলেরা মশালের আলোয় মাছ ধরে; রাজপুত্রের কথাই বলাবলি করে তারা, কত তার মহৎ কীর্তি। সে-সব কথা শুনতে-শুনতে জলকন্যার মন সুখে ভরে ওঠে; ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে সে-ই তো তাকে বাঁচিয়েছিল, আর সে শুয়েছিল তার হাতের উপর অবশ মাথা রেখে—কিন্তু সে তো তা জানে না, কিছুই জানে না, স্বপ্নেও ভাবতে পারে না।

সব মানুষ জলকন্যার ক্রমেই প্রিয় হয়ে উঠতে লাগল। আহা, সে যদি মানুষ হত! কত বড়ো মানুষের পৃথিবী, সমুদ্রের উপর দিয়ে জাহাজে করে তারা উড়ে যায়, মেঘ-মাড়ানো পাহাড়ের চূড়ায় বেয়ে ওঠে; আহা, তাদের বন-জঙ্গল ধূ-ধূ কতদূর চলে গেছে, অতদূর জলকন্যার চোখ যায় না।

অনেক জিনিসের মানে সে বুঝতে চায়, কিন্তু তার বোনেরা ভালো করে জবাব দিতে পারে না। যেতে হল আবার তাকে বুড়ি ঠানদির কাছে—তিনি তো 'সমুদ্রের উপরের দেশের' অনেক খবর রাখেন।

'যে-সব মানুষ ডুবে মরে না তারা কি চিরকাল বাঁচে? আমরা যারা সমুদ্রের তলায় থাকি—আমাদের মতো তারাও কি মরে না?

ঠানদি উত্তর দিলেন, 'মরে বই কি। আমাদের মতো মরতে হবে তাদেরও, তাদের জীবন আমাদের চাইতে অনেক ছোট। আমরা বাঁচি তিনশো বছর, তারপর মরে সমুদ্রের ফেনা হয়ে ভেসে বেড়াই। অমর আত্মা নেই আমাদের, নেই পুনর্জন্ম; একবার কেটে ফেলা ঘাসের মতো আমরাও চিরকালের মতো যাই শুকিয়ে। কিন্তু মানুষের বেলায় শরীর ধুলো হয়ে গেলেও আত্মা থাকে বেঁচে; আমরা যেমন মানুষের বাড়ি-ঘর দেখবার জন্যে জল থেকে উঠি, তারা ওঠে উপর-আকাশের অজানা অপরূপ রাজ্যের দিকে, যাকে বলে তারা স্বর্গ—আমরা তা দেখতে পারি না।'

'আমাদের আত্মা নেই কেন?' ছোট্ট জলকন্যা জিজ্ঞেস করল। 'আমি তো অনায়াসে তিনশো বছরের আয়ু ছেড়ে দিতে পারি, যদি একদিনের জন্যেও মানুষ হয়ে বাঁচতে পাই, যদি পাই স্বর্গের সেই বাড়ির খোঁজ!'

ঠানদি বলল, 'এ-সব কথা ভুলেও মনে আনিস না। ঢের ভালো আছি আমরাই; কত বেশিদিন বাঁচি, কত সুখে থাকি!'

'একদিন তো মরতেই হবে, তারপর সমুদ্র আমাকে ফেনার মতো অবিশ্রান্ত আছড়াবে, চূরমার করে ভেঙে উড়িয়ে দেবে হাওয়ায়, আর কখনো মাথা তুলে শুনব না সমুদ্রের গান, কখনো দেখব না সুন্দর ফুলগুলো আর এই উজ্জ্বল সূর্য। আচ্ছা ঠানদি, অমর আত্মা কি পাওয়া যায় না কিছুতেই?'

'পাগল! এ অবিশ্যি সত্যি কথা যে যদি কোনো মানুষ তোকে এত ভালোবাসে যে তার বাপ-মার চেয়েও তুই প্রিয় হয়ে উঠিস, যদি সে সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোকেই চায়, আর বিবাহের মন্ত্র পড়ে, শপথ করে বলে যে চিরকাল তোকেই ভালোবাসবে সে; তাহলে অবিশ্যি তার আত্মা উড়ে আসবে তোর মধ্যে, মানুষের সার্থকতা তুই জানবি। কিন্তু তা কি কখনো হতে পারে? আমাদের চোখে আমাদের শরীরের সবচেয়ে সুন্দর অংশ যেটা, সেই লেজটাই তো তাদের চোখে পরম কুৎসিত, তারা ওটাকে মোটেই সহ্য করতে পারে

www.pathagar.com

না। শরীরের সঙ্গে দুটো বিদঘুটে খুঁটি না-থাকলে নাকি ওদের চোখে সুন্দর দেখায় না—যাকে ওরা বলে পা।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে জলকন্যা নিজেই শরীরের দিকে তাকাল : এমন সুন্দর, এমন নরম—কিন্তু ঐ তো একটা আঁশওয়ালা লেজ !

ঠানদি বললেন, 'সুখী তো আমরাই! তিনশো বছর আমরা হেসে খেলে, লাফিয়ে-সাঁতরে বেড়াব—সেটা অনেক কাল—তারপর মরব নিশ্চিত হয়ে। আজ রাত্রে সভায় একটা নাচ আছে যে।'

রানি-মা যে-নাচের কথা বললেন, অমন জমকালো ব্যাপার পৃথিবীতে অবিশ্যি কখনো দেখা যায় নি। সবার দেয়ালগুলো সব স্ফটিকের, যেমন পুরু তেমনি স্বচ্ছ। তাদের গায়ে সারে-সারে হাজার-হাজার শঙ্খ বসানো, কোনোটার গোলাপি রং, ঘাসের মতো সবুজ কোনোটা; কিন্তু সবগুলোরই ভিতর থেকে তীব্র আলো বেরিয়ে আসছে, তাতে সমস্তটা ঘর আলোয় আলোময়। স্বচ্ছ দেয়াল ছাড়িয়ে তাদের আলো জলেও অনেকদূর গিয়ে পড়েছে; তাতে ঝলমল করে উঠছে লাখ-লাখ মাছের আঁশ—কোনোটা লাল, কোনোটা বেগুনি, কোনোটা সোনালি কি রুপোলি, একটা ছোট, একটা-বা বড়ো।

সভার মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে স্বচ্ছ উজ্জ্বল একটা স্রোত, তারই উপর নাচছে দলে-দলে জলপুরুষ আর জলকন্যা, তাদেরই নিজেদের অপরূপ কণ্ঠস্বরের তালে-তালে; অমন মধুর নাচের ভঙ্গি পৃথিবীতে কখনো দেখা যায়নি। তারি মধ্যে ছোট্ট রাজকন্যাটির গলায় যেন সুরের ফোয়ারা, তেমন তো আর-কারো নয় ! হাততালি দিয়ে তাকে ধন্যবাদ জানাল সবাই।

এতে সে খুশিই হল। সমুদ্রে কি পৃথিবীতে তার চেয়ে অপরূপ স্বর কোনোখানেই নেই, এ সে ভালো করেই জানে। একটু পরেই সে উপরকার পৃথিবীর কথাই ভাবতে লাগল; সুন্দর রাজপুত্রকে ভুলতে পারে না সে, তার যে অমর আত্মা নেই এ-দুঃখ সামলাতে পারে না সে। পিতার প্রাসাদ থেকে পালিয়ে এল সে; ভিতরে যখন বয়ে চলেছে উৎসবের স্রোত, তার ছোট্ট উপেক্ষিত বাগানে গিয়ে বসে রইল সে চুপ করে।

হঠাৎ সে শুনল শিঙার ফুঁয়ের শব্দ জলের উপর দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে দূর-দূরান্তরে মিলিয়ে গেল। মনে মনে বলল সে, 'এই বুঝি সে বেরুল শিকারে—যাকে আমি বাপ-মার চেয়েও বেশি ভালোবাসি, সবসময় ভাবি যার কথা, যার মধ্যে আমার জীবনের সব আনন্দ জমে রয়েছে। সব, সব বিপদ আমি নেব—তাকে যদি পাই, আর পাই সেই সঙ্গে অমর আত্মা। আমার বোনেরা নাচুক রাজসভায়; আমি যাব সেই ডাইনির কাছেই—চিরকাল তাকে নিদারুণ ভয় করেই এসেছি —কিন্তু এখন সে ছাড়া আমার তো উপায় নেই আর !'

গেল সে বাগান ছেড়ে। ফেনিয়ে-ওঠা যে ঘূর্ণি ছাড়িয়ে ডাইনির বাসা, গিয়ে দাঁড়াল তার ধারে। এ-পথে সে আগে কখনো আসেনি। এ-পথে ফোটে না ফুল, সাগর-ঘাস মাড়াতে হয় না। পার হয়ে আসতে হল ধূ-ধূ ধূসর বালিরাশি, তারপর ঘূর্ণি। তার জল রেল-গাড়ির চাকার মতো ফোঁসফোঁস করে ঘুরছে—যা-কিছু কাছে পায়, টেনে ছিঁড়ে নিয়ে যায় অতল পাতালে। সে জায়গা দিয়েই যেতে হল তাকে। ডাইনির দেশে যাবার আর পথ নেই যে। তারপর পার হতে হল একটা ডোবা। লিকলিকে পিছল কাদাগুলো টগবগ করে ফুটছে। ডাইনি এটাকে নাকি বলে তার খেলার মাঠ। এরপরে একটা বনের মধ্যে তার বাসা—বাসাখানাও অদ্ভুত।

www.pathagar.com

চারদিকে যত গাছ আর ঝোপঝাড় সব ফণিমনসার জাত : যেন লক্ষমুণ্ড এক-একটা সাপ ফণা উঁচু করে দাঁড়িয়ে : ডালগুলো ঠিক লম্বা লিকলিকে হাতের মতো, আঙুলগুলো জ্যান্ত পোকা। মূল থেকে মাথা পর্যন্ত প্রতি অঙ্গ সমস্ত দিকে অবিশ্রান্ত নড়ছে, বাড়িয়ে দিচ্ছে নিজেকে। যা-কিছু তারা ধরে, এমন করেই আঁকড়ে ধরে যে জন্মেও সে সব আর ছাড়ানো যায় না।

এই ভীষণ বনের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট জলকন্যা চুপ করে একটু দাঁড়িয়ে রইল। ভয়ে টিপটিপ করতে লাগল তার বুক। নিশ্চয়ই সে তখনই ফিরে যেত, যদি-না তার মনে পড়ত রাজপুত্রের কথা আর অমরতা! কথাটা ভেবে তার সাহস বেশ বেড়ে গেল। সে বেঁধে নিল তার লম্বা চুল, যাতে ফণিমনসায় আটকে না যায়। বুকের উপর হাত দু-টি চেপে ধরে মাছের মতো দ্রুতবেগে জলের ভিতর দিয়ে শোঁ করে চলে গেল সে; পার হয়ে এল বিদঘুটে গাছগুলো, খামকাই তারা পিছনে ব্যগ্র হাত বাড়াল।

এটা অবিশ্যি সে লক্ষ না করে পারলে না যে প্রত্যেকটি গাছের মুঠোর মধ্যে কিছু-না-কিছু আঁকড়ে ধরা, হাজার ছোট ছোট হাত লোহার বেড়ির মতো শক্ত হয়ে চেপে বসেছে। সমুদ্রে ডুবে মরে কত মানুষ এই পাতালে তলিয়ে গেছে; তাদের সাদা-সাদা কঙ্কাল এই ফণিমনসার মুঠোর মধ্যে থেকে বিকট দাঁত বার করে হাসছে। তারা জড়িয়ে রয়েছে ডাঙার জন্তুদের কত-কত মুণ্ডু, বুকের পাঁজর, আর আস্ত কঙ্কাল। নানা জিনিসের মধ্যে একটি জলকন্যাও দেখা গেল; তাকে তারা আঁকড়ে ধরে গলা টিপে মেরেছে। কী ভীষণ দৃশ্য বেচারা ছোট্ট রাজকন্যার চোখের সামনে!

যাই হোক, এই আতঙ্কের বনের ভিতর দিয়ে সে নির্বিঘ্নে পার হল। তারপর পিছল কাদা-ভরা একটা জায়গা, মস্ত মোটা মোটা শামুকেরা সেখানে সুড়সুড় করে বেড়াচ্ছে, আর তারই মাঝখানে ডাইনির বাড়ি—যত দুর্ভাগা জাহাজ ডুবে মরেছে, তাদের হাড় দিয়ে তৈরি। এখানে বসে ডাইনি কুচ্ছিৎ একটা কোলাব্যাংকে আদর করছিল, আমরা যেমন পোষা পাখিকে আদর করি। বিকট মোটা মোটা শামুকগুলোকে সে পায়রা বলে ডাকে—তারা তার সারা গায়ে অনায়াসে হাত-পা ছড়িয়ে বেড়ায়।

ডাইনি বলল, 'কী চাও তুমি আমার কাছে তা আমি জানি। তুমি আস্ত একটা বোকা, কিন্তু তুমি যা চাও তা-ই হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভয়ানক বিপদে পড়বে তুমি—ওগো ফুটফুটে রাজকন্যা, এ তোমাকে আগেই বলে দিচ্ছি। লেজটা তোমার পছন্দ হচ্ছে না—এই তো? চাও তুমি তার বদলে মানুষের মতো দুটো ঠ্যাং—এই তো? তাহলে রাজপুত্র তোমাকে ভালোবাসবেন, তুমি পাবে অমর আত্মা। তা-ই নয় কি?'

এ-কথা বলে ডাইনি এত চেঁচিয়ে উঠল যে তার পোষা শামুক-ব্যাংগুলো চমকে লাফিয়ে তার সারা গা থেকে পড়ল ঝরে।

'ঠিক সময়ে তুমি এসেছ,' ডাইনি বলতে লাগল। 'যদি সূর্যাস্তের পরে আসতে তাহলে আর এক বছরের মধ্যেও তোমার জন্যে কিছু করবার সাধ্যি থাকত না আমার। তোমাকে দেব খানিকটা মন্ত্র-পড়া জল,তা নিয়ে তুমি সাঁতরে ডাঙায় যাবে, তীরে বসে সেটা খাবে। অমনি তোমার লেজ খসে পড়বে, গজিয়ে উঠবে লম্বা দুটো কাঠি, মানুষের অতি আদরের পা। কিন্তু মনে রেখো—ভীষণ লাগবে, ভীষণ কষ্ট পাবে; মনে হবে তোমার শরীরের ভিতর দিয়ে কেউ ধারাল একটা ছুরি চালিয়ে নিয়ে গেল। এই রূপান্তরের পর যে যে দেখবে তোমাকে, সে-ই বলে উঠবে তুমি পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী কন্যা; থাকবে তোমার ভঙ্গির

www.pathagar.com

লাবণ্য, এত হালকা পা কোনো নর্তকীর নয়; কিন্তু প্রতিবার পা ফেলতে তোমার অসহ্য যন্ত্রণা হবে—হাঁটছ যেন খোলা তরোয়ালের ধারের উপর দিয়ে, রক্ত পড়বে স্রোতের মতো। পারবে তুমি এত কষ্ট করতে? যদি পারো, তাহলেই তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করি।'

'পারব, .পারব,' ক্ষীণস্বরে বলল রাজকন্যা। মনে পড়ল তার রাজপুত্রকে, এত দুঃখে তাকেই তো পাবে সে—আর পাবে অমর আত্মা।

ডাইনি বলতে লাগল,—'ভেবে দেখো—একবার মানুষ হয়েছ কি আর কোনোদিন জলকন্যা হতে পারবে না। পারবে না কখনো বোনদের কাছে ফিরতে, যেতে পারবে না বাপের বাড়ি। আর যদি এমন হয় যে রাজপুত্র তোমাকে এমন একান্ত ভালোবাসল না যে তোমার জন্যে সে বাপ-মাকে ছাড়তেও প্রস্তুত হতে পারে, যদি তুমি তার সমস্ত ভাবনায় আর প্রার্থনায় জড়িয়ে যেতে না-পারো, যদি-না পুরোহিতের মন্ত্রে তোমাদের বিয়ে হয়—তাহলে যে অমরতা তুমি চাও তা কখনো পাবে না, কখনো না। যে-রাতে রাজপুত্র অন্য একজনকে বিয়ে করবে, সে-রাত্রি ভোর হতেই তোমার মৃত্যু। দুঃখে তখন ভেঙে যাবে তোমার বুক, সমুদ্রের ফেনা হয়ে ভাসবে তুমি।'

মুমূর্ষুর মতো ম্লানমুখে বলল জলকন্যা, 'তবু, তবু আমি সাহস করব।'

'আর-একটা কথা। আমাকেও তোমার কিছু দিতে হবে তো—এত কাণ্ড করা কি সহজ কথা! সমুদ্রের তলায় তোমাদের সকলের কণ্ঠই মধুর, তার মধ্যে সবচেয়ে মধুর তোমার কণ্ঠ। তা-ই দিয়ে রাজপুত্রকে মুগ্ধ করবে ভেবেছ তো? কিন্তু তোমার এই কণ্ঠস্বরই আমি চাই। তোমার মধ্যে সবচেয়ে যেটা ভালো জিনিস, তা-ই এই মন্ত্র-পড়া জলের দাম; নিজের রক্ত মিশিয়ে সেটা তৈরি করব আমি,—খোলা তলোয়ারের মতো ধার হবে তো তার সেই জন্যেই।'

জলকন্যা বলল, 'আমার কণ্ঠই যদি কেড়ে নিলে তাহলে আমার আর রইল কী? কী দিয়ে রাজপুত্রকে মুগ্ধ করব?'

'রইল তোমার অঙ্গের লাবণ্য, তোমার ভঙ্গির শ্রী, তোমার কথাভরা দৃষ্টি। এ-সব জিনিস নিয়ে মানুষের তরল চিত্তকে মুগ্ধ করা সহজই হবে। বেশ! সাহসে কুলোবে তা? জিভ বার করো—ওটা কেটে নিয়ে আমি নিজে রাখব। মন্ত্র-পড়া জলের এই দাম।'

'তা-ই হোক!' বলল রাজকন্যা।

ডাইনি তখন ফুটন্ত কড়াইয়ে সেই বিষ তৈরি করতে লাগল। আগে সে কড়াইটা ব্যাং-শামুক দিয়ে বেশ ভালো করে মুছে নিলে; বললে, 'বিশুদ্ধভাবে সব করতে হয়।' তারপর তার বুকে একটু আঁচড় কাটল, কালো-কালো রক্ত গড়িয়ে পড়ল কড়াইতে আলকাতরার মতো। সঙ্গে-সঙ্গে অনেকরকম মশলা ঢালা হল তারপর কড়াই থেকে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে ধোঁয়া উঠতে লাগল এমন বিকট বীভৎস মূর্তিতে যে দেখল ভয়ে মূর্ছা যেতে হয়। তার ভিতর থেকে আবার কঁকানি-গোঙানির শব্দ আসছে—অনেকটা কুমিরের কান্নার মতো। অনেকক্ষণ পরে মন্ত্র-পড়া জল পরিষ্কার জলেরই মতো টলটলে দেখা গেল—তৈরি হয়েছে।

ডাইনি বলল জলকন্যাকে, 'তবে, এই নাও।' সঙ্গে-সঙ্গে তার জিভটা টেনে কেটে ফেলল। বোবা হয়ে গেল ছোট্ট জলকন্যা—না-পারে সে কথা বলতে, না-পারে গাইতে। যাবার সময় ডাইনি বলে দিলে, 'যদি ফণিমনসারা তোমাকে ধরতে আসে, এই জলের একটুখানি ছিটিয়ে দিয়ো—তাদের ডানাগুলি হাজার টুকরো হয়ে ছিঁড়ে যাবে।'

www.pathagar.com

কিন্তু এ-উপদেশের কোনো দরকারই ছিল না। চকচকে শিশিটা তার হাতে তারার মতো ঝলমল করছে—তা-ই দেখেই ভয়ে মরে গেল ফণিমনসারা। পার হয়ে এল সে ভীষণ বন, পার হয়ে এল ডোবা, ছাড়িয়ে এল ফেনাল ঘূর্ণি।

এইবার সে পিতার প্রাসাদের দিকে তাকাল। নিবে গেছে সভার আলো, সবাই ঘুমিয়েছে। ভিতরে সে কেমন করে যাবে—গেলে তো কোনো কথাই বলতে পারবে না! শেষবারের মতো ছেড়ে যেতে হচ্ছে এই বাড়ি—কষ্টে তার বুক প্রায় গেল ভেঙে। লুকিয়ে সে গেল বাগানে, প্রতি বোনের কুঞ্জ থেকে একটি করে ফুল নিল ছিঁড়ে নিজেরই হাতে, চুমো খেল অনেকবার; তারপর ঘন-নীল জলের ভিতর দিয়ে ভেসে উঠল সে, উপরের পৃথিবীতে।

তখনো সূর্য ওঠেনি। রাজপুত্রের প্রাসাদে পৌঁছিয়ে পরিচিত সাদা সিঁড়ি দিয়ে সে উঠে এল। আকাশে তখনো চাঁদ জ্বলছে, ছোট্ট জলকন্যা শিশিতে ভরা মন্ত্র-পড়া জল ঢেলে দিল গলায়। ধারাল ছুরির মতো সেটা যেন তার ভিতরটাকে ছিঁড়ে দিয়ে গেল, মূর্ছিত হয়ে পড়ল সে। সূর্য ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে জাগল সে; তার সমস্ত শরীর অসহ্য যন্ত্রণায় পুড়ে যাচ্ছে। যাক, পুড়ে যাক! তবু তো সে পেল তার এত আরাধনার ফল, দেখতে পেল অপরূপ রাজপুত্রকে ঠিক তার সামনে, কয়লার মতো কালো চোখ মেলে তারই দিকে তাকিয়ে লজ্জা পেয়ে নিজের চোখ সে নামিয়ে নিল। এ কী! কোথায় তার মাছের মতো লেজ? কোমল মসৃণ দুটি পা নেমে এসেছে যে! কিন্তু কোনো আবরণ নেই তার : বৃথাই সে চেষ্টা করলে তার লম্বা ঘন চুল দিয়ে নিজেকে ঢাকতে।

রাজপুত্র জিজ্ঞেস করল সে কে, কী করেই-বা এখানে এল। উত্তরে সে তার উজ্জ্বল নীল চোখ দুটো বড়ো করে মেলে তাকাল, একটু হাসল—হায়, সে তো কথা বলতে পারে না! রাজপুত্র তাকে হাতে ধরে প্রাসাদের ভিতরে নিয়ে গেল। ডাইনি ঠিকই বলেছিল, তার এমন লাগল যেন খোলা তলোয়ারের ধারের উপর দিয়ে হাঁটছে সে, কিন্তু সে-কষ্টটা অনায়াসেই সহ্য করল, এগিয়ে গেল সে দখিন হাওয়ার মতো হালকা পায়ে; যে দেখল তাকে সে-ই অবাক হল তার লঘু লীলার লাবণ্য দেখে।

প্রাসাদে ঢুকল সে, তার জন্যে আনা হল রেশমের আর মসলিনের বাহারে কাপড়; সেখানে যারা থাকে, তার মতো সুন্দর কেউ নয়—কিন্তু সে না-পারে কথা বলতে, না-পারে গাইতে। রাজা-রানি আর রাজপুত্রের সামনে রোজ গান করে কয়েকজন দাসী, তাদের রেশমি কাপড়ে সোনালি বুটি তোলা; তাদের মধ্যে একজনের পরিষ্কার সুন্দর গলা শুনে রাজপুত্র খুশিতে হাত-তালি দিয়ে উঠলেন। তাতে জলকন্যার মনে বড়ো কষ্ট হল : সে তো জানে এর চেয়ে ঢের বেশি সুন্দর ছিল তার গান! সে ভাবল, 'হায়রে, তার জন্যে যে আমি আমার এমন কণ্ঠস্বর চিরকালের মতো খুইয়ে বসেছি তা তা সে জানেই না!'

দাসীরা নাচতে শুরু করল। তখন উঠল আমাদের জলকন্যা; লীলায়িত শুভ্র দুই বাহু বাড়িয়ে দিয়ে মৃদুভঙ্গিতে যেন হাওয়ায় সে ভেসে বেড়াতে লাগল। প্রতিটি ভঙ্গিতে ফুটে উঠল তার অঙ্গের নিখুঁত লাবণ্যের ছন্দ; তার উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টিতে যে-কথা ঝলমল করে উঠল তা দাসীদের গানের চাইতে অনেক নিবিড় হয়ে মর্মে গিয়ে বাজল।

সকলেই মুগ্ধ হল। সবচেয়ে মুগ্ধ হল রাজপুত্র। সে তাকে ডাকল, 'আমার কুড়িয়ে-পাওয়া লক্ষ্মী!' বার-বার নাচল সে, যদিও প্রতিটি পা ফেলতে অসহ্য যন্ত্রণা হল তার। রাজপুত্র বলে দিল সে সব সময় তার সঙ্গে-সঙ্গে থাকবে; তারই পাশের ঘরে মখমলের বালিশে মসলিনের বিছানা পাতা হল জলকন্যার।

www.pathagar.com

রাজপুত্র তাকে পুরুষের পোশাক তৈরি করিয়ে দিলেন; ঘোড়ায় চড়ে সে যখন বেরোবে এই কুড়িয়ে-পাওয়াও যাবে তার সঙ্গে। এক-সঙ্গে কত সুগন্ধি বনে তারা বেড়াল, সবুজ ডালপালা ছুঁয়ে-ছুঁয়ে গেল কাঁধ, নতুন পাতার বেড়ে লুকোনো পাখিদের গানের জলসায় কী ফুর্তি! উঠল জলকন্যা তার সঙ্গে খাড়া পাহাড়ে, নরম পা ফেটে রক্ত বেরুল, অনুচরেরা ছুটে এল হাঁ-হাঁ করে। কিন্তু মুচকি একটু হেসে সে উঠল রাজপুত্রের সঙ্গে আরো উঁচুতে; সেখানে দেখা যায় মেঘেরা পায়ের নিচে হেসে-হেসে গড়াগড়ি যাচ্ছে; ছুটছে এ-ওর পিছনে, যেন একঝাঁক পাখি দেশান্তরে চলেছে উড়ে।

রাত্রে, প্রাসাদের সবাই যখন ঘুমে বিভোর, রাজকন্যা পাথরের সিঁড়ি দিয়ে আস্তে নেমে এসে জলে পা ডুবিয়ে বসে থাকে; তখন তার মনে পড়ে জলের নিচে তার প্রিয়জনদের।

এক রাত্রে, তখন সে সিঁড়িতে বসে পা ধুচ্ছে, তার বোনেরা সাঁতরে এল সেখানটায় একসঙ্গে, হাতে হাত ধরে, গান গাইতে-গাইতে। কী করুণ সে-গান! সে ডাকলে তাদের; বোনেরা তাকে দেখেই চিনতে পারলে; সে চলে আসায় তাদের বাড়িতে কত দুঃখ সে-কথা তাকে না-বলে পারলে না। এর পর থেকে বোনেরা রোজ রাত্রেই আসে; একবার সঙ্গে করে বুড়ি ঠানদিকেই নিয়ে এসেছিল—অনেকদিন জলের উপরকার দেশটি দেখেননি তিনি। একদিন সাগর-রাজাও এলেন, মাথায় তাঁর সোনার মুকুট; কিন্তু এঁরা দুজন ডাঙার খুব কাছে ভিড়তে সাহস পেলেন না, মেয়ের সঙ্গে তাই কোনো কথাই বলা হল না।

এদিকে ছোট্ট জলকন্যাটি ক্রমেই রাজপুত্রের বেশি প্রিয় হয়ে উঠছে। কিন্তু তার কাছে সে কুড়িয়ে-পাওয়া লক্ষ্মীই, তার বেশি কিছু নয় সে; ফুটফুটে মিষ্টি খুকুমণি—তাকে বিয়ে করবার কথা তার মাথায়ই এল না কখনো। কিন্তু বিয়ে না-করলে কী করে সে পাবে অমর আত্মা? বিয়ে তাকে করতেই হবে—নয়-তো ফেনা হয়ে যাবে সে, ছুটতে হবে তাকে চিরকাল, সমুদ্রের অশ্রান্ত ঢেউয়ে-ঢেউয়ে ধাক্কা সয়ে।

রাজপুত্র যখন তাকে বুকে নিয়ে আদর করেন, তার চোখ যেন জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কি আর-সকলের চেয়ে বেশি ভালোবাসো না আমাকে?'

রাজপুত্র বলেন, 'সব চেয়ে তোমাকেই তো ভালোবাসি—তোমার মতো ভালো আর কে? তুমিও তো আমাকে কম ভালোবাসো না; একবার একটি মেয়েকে পলকে দেখেছিলাম, আর বোধ হয় কখনোই দেখব না—তুমি অনেকটা তার মতোও। ছিলেম একবার এক জাহাজে, ডুবল জাহাজ, ঢেউয়ের ঘা খেয়ে-খেয়ে ঠেকলাম গিয়ে তীরে এক মন্দিরের ধারে, সেখানে একদল মেয়ে পুজোআর্চা নিয়ে আছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট্টটি কুড়িয়ে পেল আমাকে, প্রাণ বাঁচাল আমার। একবার শুধু তাকে আমি দেখেছিলাম, কিন্তু তার ছবি আমার স্মৃতিতে আঁকা হয়ে গেছে, তাকে ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসতে পারব না। কিন্তু সে তো দেবতার সেবিকা, কী করে পাব তাকে? তুমি তার মতোই দেখতে, সেই জন্যেই বুঝি এসেছ আমাকে সান্ত্বনা দিতে। আমাকে কখনো ছেড়ে যেয়ো না।'

জলকন্যা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবল, হায় রে, সে তো জানে না আমিই তার প্রাণ বাঁচিয়েছিলাম! দুরন্ত ঢেউগুলোর উপর দিয়ে তাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলাম বনের মধ্যে সেই মন্দিরের ধারে; বসেছিলাম পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে—এক্ষুনি কেউ এসে পড়বে, এই আশায়। তারপর দেখলাম সেই সুন্দর মেয়েটিকে এগিয়ে আসতে তাকেই সে ভালোবাসে আমার চেয়ে বেশি!' সে আর-একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল, জলকন্যা তো কাঁদতে পারে না! 'সে-মেয়ে নাকি দেবতার সেবিকা, মন্দির ছেড়ে কখনো আসতে পারবে

www.pathagar.com

না, আর তো তাদের দেখা হবে না! আমি আছি সব সময় তার সঙ্গে-সঙ্গে, রোজ তাকে দেখি; আমি তাকে ভালোবাসব, সমস্ত জীবনটা উৎসর্গ করব তাকেই।'

এদিকে রাজ-অমাত্যরা বলাবলি করে, 'প্রতিবেশী রাজার মেয়ের সঙ্গে আমাদের রাজপুত্রের তো বিয়ে। মস্ত জাহাজ সাজানো হচ্ছে সেই জন্যেই। সকলকে জানানো হয়েছে তিনি দেশভ্রমণে বেরোচ্ছেন, আসলে কিন্তু যাচ্ছেন রাজকন্যাকে আনতে, লোকজন সৈন্য-সামন্ত বিস্তর যাবে সঙ্গে।' এ-সব কথা শুনে জলকন্যা মুচকি হাসে; রাজপুত্রের মনের আসল ভাবখানা তার চেয়ে ভালো কে জানে!

একদিন রাজপুত্র তাকে বললেন, 'আমাকে তো যেতে হচ্ছে। সুন্দরী রাজকন্যাকে দেখতে যেতেই হবে আমাকে, আমার মা-বাবার ইচ্ছে তা-ই। কিন্তু সেই মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে আনতেই হবে—এমন কোনো জোর তাঁরা করবেন না। অবিশ্যি আমার পক্ষে তাকে ভালোবাসাও অসম্ভব; মন্দিরের সেই মেয়ের মতো তুমি দেখতে বলে কি আর সে-ও তেমন হবে! যদি বিয়ে করতেই হয়, বরং তোমাকেই করব—আমার কুড়িয়ে-পাওয়া লক্ষ্মী, মুখে কথা নেই, চোখ-ভরা কথা!' এই বলে সে তার চুলগুলো আঙুলে জড়িয়ে একটু আদর করল; সঙ্গে-সঙ্গে জলকন্যার মন মানুষের সার্থকতা আর অমর আনন্দের মধুর স্বপ্নে দোলা দিয়ে উঠল।

জমকালো জাহাজ চড়ে প্রতিবেশী রাজার দেশে যেদিন যাত্রা, সেদিন রাজপুত্র বলল জলকন্যাকে, জাহাজে তার পাশে দাঁড়িয়ে, 'লক্ষ্মী খুকু, সমুদ্রে তোমার ভয় করে না তো?' তারপর বলল, 'ঝড়ে সমুদ্র কেমন পাগল হয়ে ওঠে; জলের নিচে থাকে কত অদ্ভুত মাছ, কত আশ্চর্য জিনিস যা ডুবুরিরা দেখে!' জলকন্যা একটু হাসল এ-সব কথা শুনে, সমুদ্রের তলায় কী আছে না আছে তা কি তার চেয়ে ভালো জানে পৃথিবীর কোনো মানুষ।

রাত্রে চাঁদ উঠেছে আকাশে, জাহাজের সবাই ঘুমিয়ে, সমুদ্রের ভিতরে তাকিয়ে সে বসে রইল। জাহাজ চলেছে সমুদ্রকে চিরে, জল উঠছে ফেনিয়ে; সেদিকে তাকাতে-তাকাতে তার মনে হল সে যেন তার বাবার প্রাসাদ দেখতে পাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছে তার ঠানদির রুপোলি মুকুট। তারপর দেখল তার বোনেরা জল থেকে উঠে আসছে, ভারি ম্লান তাদের মুখ, হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে তার দিকে। সে হাসল তাদের দিকে তাকিয়ে; সে যেমনটি চেয়েছিল ঠিক তেমনটি সব ঘটছে এই কথা তাদের বলতে যাবে, এমন সময় সেখানে এসে পড়ল একজন খালাসি। তাকে দেখেই বোনেরা হঠাৎ এমন ডুব দিলে জলের মধ্যে যে খালাসি ছোকরা মনে করল জলের উপর সে শুধু ফেনাই দেখছিল—আর-কিছু নয়।

পরের দিন সকালে জাহাজ ঢুকল রাজধানীর বন্দরে। বাজল শঙ্খ, বাজল জয়ঢাক, সৈন্যেরা মিছিল করে গেল শহরের ভিতর দিয়ে, উড়ল নিশান, চলল ঝলসানো সঙিন। রোজই নতুন-নতুন আমোদ, নাচ-গান, খাওয়া-দাওয়া লেগেই আছে। কিন্তু রাজকন্যা তখন সেখানে নেই, তাঁকে পাঠানো হয়েছে দূরের দেশে লেখাপড়া শিখতে, রাজবংশের সবরকম গুণপনা সেখানে তিনি আয়ত্ত করছেন। কিছুদিন পর তিনি ফিরলেন দেশে।

এই আশ্চর্য রাজকন্যাকে দেখতে ছোট্ট জলকন্যা কিছু উৎসুকই ছিল—যখন দেখল স্বীকার করতে বাধ্য হল—সুন্দরী বটে, এত সুন্দর কোনো মেয়ে সে কখনো দেখেনি!

রাজকন্যার গায়ের চামড়া এমন শাদা আর নরম যে তার ভিতর দিয়ে নীল শিরাগুলো যেন স্পষ্ট ফুটে বেরিয়েছে; বাঁকা ভুরুর নিচে ঝকঝক করছে কালো একজোড়া চোখ।

www.pathagar.com

'এ যে সেই!' রাজপুত্র বলে উঠল তাকে দেখেই। 'এ-ই তো আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল—মড়ার মতো যখন পড়ে ছিলাম সমুদ্রের ধারে!' সলজ্জ বধূকে সে নিলে কাছে টেনে। তারপর বোবা কুড়িয়ে পাওয়া জলকন্যাকে বলল, 'আজ আমার সুখের সীমা নেই! যা আমি আশা করতে সাহস পাইনি তা-ই হয়েছে। আমার সুখে তুমিও কি আজ সুখী হবে না? আশেপাশের সকলের মধ্যে তুমিই তো আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসো!'

বোবা জলকন্যা দুঃখে একবার রাজপুত্রের হাত চেপে ধরল। এখনই কেন ভেঙে যাচ্ছে তার বুক; যদিও সেই বিয়ের রাত এখনো ভোর হয়নি,—তার মরণের দিন! আবার মন্দিরে বাজল শঙ্খ, দূতেরা বেরুল শহরের পথে-পথে আসন্ন বিবাহের ঘোষণা নিয়ে। বেদীতে জ্বলল রুপোর প্রদীপে সুগন্ধি আগুন, পুরোহিত সোনার ধূপতিতে ধুনো দিল, বর-বধূ হাতে হাত রাখল, উচ্চারিত হল বিবাহের পবিত্র মন্ত্র।

ছোট্ট জলকন্যা পরেছে আজ রেশমের আর সোনার কাপড়, রাজকন্যার ওড়নার আঁচল ধরে পিছনে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু না-দেখছিল তার চোখ সেই শুভ অনুষ্ঠান, না-শুনছিল সে গুরুগম্ভীর বিবাহের বাজনা; শুধু সে ভাবছিল তার আসন্ন অবসানের কথা; তার মনে হল পৃথিবী ও স্বর্গ দুই-ই সে হারাল।

সেই সন্ধ্যাতেই বর-বধূ জাহাজে গেল ফিরে। গর্জ্জাল কামান, হাওয়ায় উড়ল নিশান, আর জাহাজের খোলা ছাদে সোনালি কাপড়ের অপরূপ শামিয়ানার তলায় কিংখাপের নরম জাজিম পাতা হল—বর-বধূ রাত্রে সেখানে শোবেন। অনুকূল হাওয়া উঠল; নীল জলের উপর দিয়ে জাহাজ হালকা ছন্দে চলল দুলে-দুলে।

অন্ধকার হবার সঙ্গে সঙ্গেই রাশি রাশি রঙিন আলো জ্বলে উঠল, ছাদের উপর শুরু হল নাচ। জীবনে প্রথমবার সমুদ্র থেকে মাথা তুলে যে-দৃশ্য সে দেখেছিল জলকন্যার তা মনে পড়ে গেল।

এ-দৃশ্যও তেমনি জমকালো—তাকেও যোগ দিতে হল নাচে, জাহাজের তক্তার উপর পাখির হালকা পায়ে সে ঘুরে বেড়াতে লাগল। মুগ্ধ হয়ে গেল সবাই, এত সুন্দর সে কখনো নাচেনি। ভীষণ লাগল তার ছোট দুটি পায়ে; কিন্তু সে-কষ্ট যেন তার আজ লাগলই না—অনেক বেশি কষ্ট যে তার মনে।

আজকের পরে সে আর তাকে দেখবে না—যার জন্য সে ছেড়ে এসেছে বাড়ি-ঘর, বাপ-মা, হারিয়েছে তার অপরূপ-কণ্ঠস্বর, রোজ সয়েছে অসহ্য যন্ত্রণা—আর সেই মানুষটি একফোঁটা সন্দেহও করে না—তার জন্যেই তো সে এত সব করেছে! আজই শেষ। এর পরে সে আর নিঃশ্বাসে সেই বাতাস টানবে না যে-বাতাসে তার প্রিয়তমের জীবন; আর দেখবে না ঘন-নীল সমুদ্র, তারায় ছাওয়া আকাশ। আসছে চিরন্তন রাত্রি—সেখানে আর-কোনো ভাবনা নেই, কোনো স্বপ্ন নেই। জাহাজের উপর বয়ে চলেছে ফূর্তির স্রোত; সে-ও দুপুর রাত পর্যন্ত সকলের সঙ্গে হাসল, নাচল—মনের মধ্যে তার নিঃশেষ হয়ে-যাওয়া মৃত্যুর ভাবনা। তারপর রাজপুত্র গেল তার সুন্দরী বধূকে নিয়ে জমকালো শামিয়ানার নিচে বিশ্রাম করতে।

এখন সব চুপচাপ; হাল ধরে একা একজন মাল্লা দাঁড়িয়ে। জাহাজের সিঁড়িতে শাদা হাত দুটি হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পুবের আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল সে। কখন ভোর হবে? সূর্যের প্রথম আলোর রেখাই তো তার মৃত্যুর তলোয়ার! তার বোনেরা জল থেকে এল উঠে, মৃত্যুর মতো ম্লান তাদের মুখ; এত সুন্দর লম্বা চুল তাদের ছিল, ঘাড়ের উপর দিয়ে ফুরফুর করে উড়ত—এখন আর নেই।

www.pathagar.com

কী হল চুল?

'চুল দিয়েছি আমরা ডাইনিকে', তারা বলল। 'যাতে তোমাকে মরতে না-হয়, যাতে সে তোমার জন্যে কিছু করে। ডাইনি দিয়েছে এই ছুরিটা তোমার জন্যে, এই নাও। সূর্য উঠবার আগেই এটা দেবে রাজপুত্রের বুকে বসিয়ে; যেই তার গরম রক্তের ফোঁটা তোমার পায়ের উপর পড়বে, তোমার লেজ আবার হয়ে যাবে। আবার হবে তুমি জলকন্যা, সমুদ্রের ফেনা হয়ে যাবার আগে বেঁচে নেবে পুরো তিনশো বছর। শিগরির করো, শিগ্‌রির! সূর্যোদয়ের আগে হয় সে মরবে, কি মরবে তুমি।

'বুড়ো ঠানদি আমাদের রোজই কাঁদে তোমার জন্যে, কাঁদতে কাঁদতে চোখ অন্ধ হয়ে গেছে তাঁর, মাথার চুল সব পড়ে গেছে—যেমন গেছে আমাদের চুল ডাইনির কাঁচিতে। মারো, মারো রাজপুত্রকে, এস আমাদের কাছে! এক্ষুনি! দেখছ-না পুবের আকাশে গোলাপি আভা, সূর্য উঠল বলে! সূর্য উঠলেই তো তোমার শেষ!

এই বলে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে তারা গেল মিলিয়ে।

বর-বধূ যেখানে শুয়ে, ছোট্ট জলকন্যা তার সোনালি পরদা সরিয়ে ঢুকল; তাকিয়ে দেখল রাজপুত্রকে, চুমু খেল তার কপালে; তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল, আলো প্রতি মুহূর্তেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। রাজপুত্র ঘুমের মধ্যে অস্ফুট-স্বরে কী বলল—তার বধূর নাম; তার স্বপ্ন সে দেখেছে, শুধু তারই—এদিকে জলকন্যার হাতে কাঁপছে সেই সর্বনেশে ছুরি।

হঠাৎ সে দূরে সমুদ্রে ফেলে দিলে মৃত্যুর সেই ধারাল জিহ্বা; জ্বলন্ত লাল ঢেউগুলো লাফিয়ে উঠল সবদিকে; ঢেউয়ের উপর দিয়ে নেচে চলল যেন এক পাগলি মেয়ে, মুকুট তার টাটকা রক্তে ছোপানো। তার প্রিয়তম রাজপুত্রের দিকে শেষবার যে-চোখ মেলে জলকন্যা তাকাল তা ক্রমেই স্থির, ঘোলাটে হয়ে এল; তারপর সে জাহাজ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সমুদ্রে, নিশ্চিত বুঝতে পারলে যে তার শরীর আস্তে আস্তে ফেনা হয়ে গলে যাচ্ছে।

জলের বিছানা থেকে উঠল সূর্য; এমন কোমল উষ্ণ হয়ে আলোর পাপড়িগুলো পড়ল তার সারা গায়ে যে জলকন্যা প্রায় বুঝতেই পারল না যে সে মরছে। এখনো সে দেখছে জ্যোতির্ময় সূর্যকে, তার মাথার উপর ভাসছে হাজার হাজার স্বচ্ছ সুন্দর মূর্তি; এখনো তার চোখে ভেসে উঠছে জাহাজের শাদা পাল, অরুণ উষার আলোর নাচ। মাথার উপরে সেই অশরীরী জীবদের কণ্ঠস্বরে ঝরে পড়ছে সুর—তা এমনই মধুর, এমনই কোমল যে মানুষের কানে সে শব্দ ধরাই পড়ে না, যেমন ধরা পড়ে না মানুষের চোখে তাদের মূর্তি। তাকে ঘিরে তারা ঘুরে ঘুরে উড়ে বেড়াল,—যদিও পাখা তাদের নেই—নিজেদেরই লঘুতা ইচ্ছার বেগে তাদের ঠেলে উড়িয়ে নিয়ে যায়। শেষটায় জলকন্যা দেখল যে তার শরীরও ওদের মতো হালকা হয়ে যাচ্ছে; মনে হল কেন যেন তাকে সমুদ্রের ফেনা থেকে আস্তে আস্তে ঠেলে তুলছে উপরের দিকে।

'কোথায় আমি? যাচ্ছি কোথায়?' সে জিজ্ঞেস করল। তার কণ্ঠস্বর বেরুল, শোনাল ঠিক ঐ আকাশ-কন্যাদের মতো। সে শব্দ অলৌকিক, শান্ত, স্নিগ্ধ। তার মধুর কোমলতা অন্তরের গহনতলে নিবিড় হয়ে ঝরে পড়ল।

আকাশ-কন্যাদের একজন বলল, 'তুমি যে আমাদের মধ্যে এসে পড়েছ! আজ হতে তুমিও যে আকাশ-কন্যা! জলকন্যার অমর আত্মা নেই; কোনো মানুষের ভালোবাসা পেলে তার আত্মা অমর হয়ে ওঠে। তার অনন্ত জীবন অপরের ওপর নির্ভর করে।'

www.pathagar.com

'অমর আত্মা আকাশ-কন্যাদেরও নেই; আমরা তা অর্জন করি নিজেদের ভালো কাজের জোরে। আমরা উড়ে যাই গরম দেশে; যেখানে পৃথিবীর ছেলেমেয়েরা বিষাক্ত হাওয়ার ঝাপটায় ধুঁকছে। আমাদের স্নিগ্ধ নিশ্বাসে হাওয়ার বিষ চলে যায়, তাদের প্রাণ বাঁচে। বাতাসের মধ্যে আমরা ছড়িয়ে যাই প্রাণের শীতল হাওয়া, তাকে সুরভিত করে তুলি ফুলের মিষ্টি গন্ধে; এমনি করে সমস্ত পৃথিবীতে বিলিয়ে যাই স্বাস্থ্য আর আনন্দ। তিনশো বছর ধরে এমনি সুকীর্তির জোরে আমরা অমরতা লাভ করি—মানুষের চিরন্তন সার্থকতার অংশীদার হই। আর তুমি ছোট্ট জলকন্যা—তুমি তোমার প্রাণপণ করে রাজপুত্রকে বাঁচিয়েছ; হৃদয়ের প্রেরণায় মানুষের প্রেমের জন্য এত করেছ; এত দুঃখ পেলে আমাদের মতো মানুষের সেবায়—এখন তুমি অপরূপ দেহ নিয়ে উঠে এসেছ পরীদের আকাশে; এখন তিনশো বছর ধরে সুকাজ করলে অমর আত্মা লাভ করতে পারবে।

ছোট্ট জলকন্যা সূর্যের দিকে বাড়িয়ে দিলে তার আলোক-উজ্জ্বল দৃষ্টি, তার সরল কোমল দুটো স্বচ্ছ দীঘল বাহু; তারপর—জীবনে প্রথমবার জলে ভিজে উঠল তার চোখ।

এদিকে জাহাজে সবাই উঠেছে জেগে, আবার শুরু হয়েছে উৎসব। সে দেখল রাজপুত্র নববধূকে নিয়ে বসে আছে; তাকে খুঁজে না পেয়ে তাদের মন বড় খারাপ; ম্লান মুখে তারা তাকিয়ে আছে নিচুমুখে ঢেউয়ের ফেনার দিকে—যেন তারা জানে ঐ সমুদ্রের ঢেউয়ের মাঝে ঝাঁপ দিয়েছে সে। অদৃশ্য হয়ে জলকন্যা রাজপুত্রের কপালে চুমু দিলে, হাসল তার দিকে তাকিয়ে; তারপর আকাশ-কন্যাদের সঙ্গে উড়ে মিলিয়ে গেল জাহাজের উপর দিয়ে ভেসে-যাওয়া গোলাপি মেঘের মধ্যে, তাদের সঙ্গে-সঙ্গে ভেসে গেল দিগন্ত ছাড়িয়ে।

'তিনশো বছর পরে আমরাও যাব স্বর্গরাজ্যে', সে বলল।

একজন কানে-কানে বলল, 'আরো আগেই যেতে পারি। যে-সব মানুষের বাড়িতে ছোট ছেলেমেয়ে আছে, তাদের ভিতর অদৃশ্য হয়ে আমরা উড়ে যাই; আর যখনই আমরা দেখতে পাই একটি ভালো ছেলে যে তার মা-বাবার বুক, মুখ উজ্জ্বল করেছে, তাঁদের স্নেহের পুতুল হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখনই ঈশ্বর আমাদের এই প্রতীক্ষার সময়টা কমিয়ে দেন।'

www.pathagar.com

মায়া তোরঙ

অনে-ক দিন আগে। এক দেশে ছিল এক সওদাগর। সওদাগরের ধন-রত্নের শুমার নেই, টাকা পয়সার গোণাগুনতি নেই। রুপোর টাকায় মস্তো একটা রাস্তা আগা-পাছতলা বাঁধিয়ে দেয়া যায়, তবুও সে টাকা ফুরোবে না— এত টাকা সেই সওদাগরের। কিন্তু তাই কি করে নাকি কেউ? তাই সওদাগরও টাকা দিয়ে পথ না বেঁধে, টাকা-পয়সা আরো বাড়িয়ে চলে।

সেই সওদাগরের দশ নয় পাঁচ নয়, একটি মাত্তর ছেলে। তাই সওদাগর-পুত্তুরের হেসে-খেলে দিন যায়।

সওদাগরের কোষাখানায় যেমন ধন-রত্ন-মণি-মাণিক্যের পাহাড়, তেমনি মাথা ভরা বুদ্ধি! সওদাগরের তাই এক টাকায় দশ টাকা হয়, আর দিনে দিনে ধনরত্ন আরো ফুলে ফেঁপে ওঠে।

এমনি করে দিনের পিঠে দিন যায়, আর সওদাগরের ধন-দৌলত বেড়ে ওঠে।

তারপর,—

একদিন সওদাগর চোখ বোজেন।

সওদাগর চোখ বোজেন, আর সওদাগর-পুত্তুর সব কিছুর মালিক হয়ে বসে। মালিক হয়ে তো বসে, কিন্তু হেসে-খেলে তার দিন কেটেছে, কাজ-কম্মো জানে না। তার ওপরে আবার ঘটে নেই একরত্তি বুদ্ধি! তাই নতুন সওদার বেসাত বন্ধ, গদিঘরে তালা। তা, টাকায় টাকা আনবে কি, সওদাগর-পুত্তুরের পুরীতে আমোদ-আল্লাদের বান ডাকে, ইয়ার-বন্ধুর হাট বসে।

এমনি করে দিন যায়, জমা-কড়িতে টান পড়ে!

তবু, সওদাগর-পুত্তুরের হুঁশ নেই। নোট দিয়ে ঘুড়ি বানায়। সওদাগর-পুত্তুর সেই ঘুড়ি মনের সুখে আকাশে ওড়ায়! সোনা-দানা দিয়ে এক্কা-দোক্কা খেলে।

www.pathagar.com

এমনি করে দিন যায়। কোষাখানা খালি খালি।

রোজগার-পত্তর নাই এক কড়া, খরচের বেলা শতেক হাত। উড়িয়ে দিলে কারুণের ধনও ফুরিয়ে যায়, রাজরাজড়া-সওদাগরের ধন তো কোন কথা। দেখতে দেখতে ফাটা শিমুল তুলোর মতো সওদাগর-পুত্তুরের সব ধন-দৌলত উড়ে যায়।

তারপর,—

তারপর আর কী? সওদাগর-পুত্তুরের মাথায় হাত। ঘরে থাকার মধ্যে আছে মাত্র একটা আংরাখা, একটা রুপোর টাকা আর এক জোড়া চটি। সওদাগরের অমন অঢেল ধনের কোষাখানা, তা, একেবারে ফাঁকা—একদম ফক্কিকার।

এখন উপায়?

সওদাগর-পুত্তুর চোখে আঁধার দেখে। ইয়ার-বন্ধুদের হাট ভাঙে, পথে দেখা হলে চিনতেও চায় না, সামনে পড়লে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

সওদাগর-পুত্তুরের দুঃখের দিন কাটে না, নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, এ-বেলা চলে তো ও-বেলা চলে না। সন্ধ্যা কাটে-তো রাত কাটতে চায় না। দুঃখের নিশি হাজার মণ ভারী হয়ে বুকের ওপরে চেপে বসে। ভাবনায়-চিন্তায় সওদাগর-পুত্তুরের দুচোখের পাতা এক হয় না। রাতের ঘুম চোখে নামে না, ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসি ফিরে যায়।

এখন হয়েছে কী, সওদাগর-পুত্তুরের সেই যে সুখের দিনের ইয়ার-বন্ধু তাদের মধ্যে একজন ছিল সত্যিকারের বন্ধু। সে ভাবল—সুখের দিনে খেয়েছি-পরেছি, নিয়েছি-খুয়েছি আর দুহাতে উড়িয়েছি। এখন দুঃখের দিনে সরে যাব? ভেবে, বন্ধুর আর যাওয়া হয় না।

থেকে তো যায়, কিন্তু সওদাগর-পুত্তুরের যদি উপকারেই না এল তবে সে থাকায় লাভ কী। লাভের মধ্যে লাভ, বোঝা বাড়ানো। তাহলে? তার আবার ভাঁড়ার-ঘরে ছুঁচোর কেত্তন, কানা-কড়ি সঞ্চয় নাই। দুঃখী বলতে দুঃখী—জনম দুঃখী, সাত কাঙালের এক কাঙাল। সাহায্য করবে কী দিয়ে।

বন্ধু উপায় ভাবতে বসে। ভেবে ভেবে কূল-কিনারা মেলে না। তখন, মনে পড়ে, ঘরে আছে শুধু সাত-পুরুষের—এক ভাঙা তোরঙ। তা, আর কিছুই যখন নাই, তো সেই তোরঙই দিয়ে দাও। বেচে দিলে কিছু না হোক, এক বুড়ি সাত কড়া কড়ি নিশ্চয়ই মিলবে। ওতে এক বেলা তো চলুক। এই সব সাত-পাঁচ ভেবে, বন্ধু, সওদাগর-পুত্তুরকে তার বাড়িতে ডেকে নিয়ে তোরঙটা দিয়ে দিল। বলল, আর তো কিছুই নাই, এই দিলাম। বেঁধে-ছেঁদে নিয়ে যাও।

নিয়ে তো যাও, কিন্তু কেমন করে? ঘরে কুটোটিও নেই। বেঁধে নেয়া দূরস্থান, এক কোণা ঢেকে দেওয়ার সংস্থান নাই। সওদাগর-পুত্তুর তোরঙের উপরে চেপে বসে গালে হাত দিয়ে ভাবে।

এখন হয়েছে কী, বন্ধুর দেয়া সাত-পুরুষের ভাঙা তোরঙটা আসলে মায়া তোরঙ—মন্তর-করা বাকসো। তালায় একটু জোরে চাপ দিলে হু হু করে আকাশে ওঠে। সওদাগর-পুত্তুর তোরঙের আজব গুণের কথা জানবে কোত্থেকে। তাই, তোরঙের ওপর বসে গালে হাত দিয়ে ভাবে আর আপন মনে এটা ওটা নাড়া-চাড়া করতে থাকে। এমনি নাড়া-চাড়া করতে করতে হঠাৎ একবার তালায় পড়ে চাপ।

যেই-না তালায় চাপ পড়া, আর যাবে কোথায়! সওদাগর-পুত্তুরকে পিঠে নিয়ে হু হু করে তোরঙ ওঠে আকাশে।

www.pathagar.com

ওঠে তো ওঠে,—দালানকোঠা আকাশছোঁয়া তালগাছের মতো চিমনি তলায় ফেলে, মেঘ ছাড়িয়ে আরো ওপরে ওঠে। উঠে;—নগর-বন্দর, ঘাট-মাঠ, খাল-বিল, পাহাড়-পর্বত পেছনে ফেলে মায়া-তোরঙ উড়ে চলে।

উড়ছে তো, উড়ছেই। থামার নাম নেই, নামবার লক্ষণ নেই। সওদাগর-পুত্তুরের চোখ ছানাবড়া। ভয়ে এই মূর্ছা যায়, তো সেই মূর্ছা যায়। সদাই শঙ্কা, বাক্‌সো বুঝি এই পড়ে এই পড়ে, সওদাগর-পুত্তুর ভয়ে মরে।

তোরঙটা পক্ষীরাজের মতো উড়ে চলেছে। নগর-বন্দর, খাল-বিল, তেপান্তরের মাঠ আর সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে শোঁ শোঁ করে উড়ে চলেছে। সওদাগর-পুত্তুর মনে মনে মাথা খোঁড়ে, হে ভগবান এবারকার মতো বাঁচিয়ে দাও! কিন্তু কে শোনে কার কথা।

উড়তে উড়তে উড়তে, মায়া-তোরঙ এসে থামে তুর্কিদের দেশে। আকাশ ছেড়ে তোরঙ মাটিতে নামে, সওদাগর-পুত্তুর হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। তোরঙ থেকে নেমে চারদিক চায়। দেখে পাশে এক গহীন বন। সওদাগর-পুত্তুর তখন সেই বনে শুকনো লতা-পাতার তলায় তোরঙ লুকিয়ে রেখে শহরের পথে বেরিয়ে পড়ে।

সওদাগর-পুত্তুরের পরনে আংরাখা, পায়ে চটি, দেখতে ঠিক তুর্কিদের মতো। ভিনদেশী সওদাগর-পুত্তুরকে কেউ বিদেশী বলে বুঝতে পারে না, কেউ সন্দো করে না। দিব্যি হাঁটতে, হাঁটতে, হাঁটতে শহরে এসে পৌঁছোয়।

নতুন শহর! সওদাগর-পুত্তুর এটা-ওটা চেয়ে চেয়ে দেখে। দেখতে দেখতে ওর চোখে পড়ে, শহরের ওই প্রান্তে আকাশ-ছোঁয়া এক পুরী। পুরী দেখে সওদাগর-পুত্তুরের চোখে ধাঁধা লাগে, অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। ভাবে, এ পুরী কার?

এদিক-ওদিক চায়, কাকে শুধোয়, কার এমন অবাক-করা পুরী!

সওদাগর-পুত্তুরের মন মানে না; কাকে শুধোয়, কাকে শুধোয়। এমন সময় তার চোখে পড়ে মাঠের ধারে এক দাসী। সেই দাসীর কোলে ফুট্‌ফুটে এক কুমার। কুমার নিয়ে দাসী বেরিয়েছে হাওয়া খেতে। সওদাগর-পুত্তুর ভাবল, ওকেই শুধোই পুরীর খবর।

ভেবে,—

এক পা এক পা করে এগিয়ে যায় দাসীর কাছে। শুধোয়, হ্যাঁগা, ভালো মানুষের মেয়ে, ওই আকাশ-ছোঁয়া, অবাক-করা পুরী কার বলতে পার? আর ওই পুরীর জানালাগুলো অত উঁচুতে কেন?

প্রশ্ন শুনে দাসী অবাক মানে। মনে মনে ভাবে, কোন দেশে এর বসত গো, রাজ্যির লোকে যে পুরীর খবর জানে, ও শুধোয় কিনা সেই পুরীর খবর।

সওদাগর-পুত্তুরের পোশাক তুর্কিদের মতো, চেহারা তুর্কিদের মতো। দাসী ভিনদেশী বলে বুঝতে পারে না। সন্দো করে না। বলে, ওটাই তো আমাদের রাজকন্যের পুরী গো, ভালো মানুষের ছেলে। রাজকন্যের খবর তুমি বুঝি কিছু জানো না? শোনো তা হলে। একদিন এক গণক্কার এসে রাজকন্যের হাত দেখে বলে মহারাজ, এ কন্যের কপালে অনেক দুঃখু আছে। কন্যের সাথে ভিনদেশী কুমারের দেখা হবে। আর, সেই দেখাই হবে কন্যের কাল। কুমারকে ভালোবেসে রাজকন্যের সারা জীবনে সুখ হবে না, চোখের জলে বুক ভাসবে।

রাজার এত আদরের একমাত্তর কন্যে, তার কপালে কিনা—জীবন ভোর চোখের জল।

গণক্কারের কথা শুনে রাজা ভাবনায় পড়েন। ভেবে ভেবে, শেষে, আকাশ-ছোঁয়া পুরী

www.pathagar.com

তৈরি করান, জানালা রাখেন অনেক উঁচুতে। যেন কন্যেকে কেউ না দেখে, কন্যে কাউকে না দেখে।

পুরী বানিয়ে রাজকন্যেকে ওখানে রেখে দেন। কন্যের পুরী ঘিরে কড়া পাহারা বসে। এক মাত্তোর রাজা-রানি ছাড়া পুরীতে কাক-পক্ষী যেতে পায় না, মশা-মাছি গলে না, এমনি কড়া পাহারা।

সওদাগর-পুত্তুর অবাক হয়ে রাজকন্যের কাহিনী শোনে। শুনে, দাসীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার বনে ফিরে আসে।

বনে ফিরে, সওদাগর-পুত্তুর রাতের আশায় বসে থাকে। ধীরে ধীরে বিকেল গড়িয়ে সাঁঝ হয়, সাঁঝ গড়িয়ে রাত আসে। সওদাগর-পুত্তুর তখন, শুকনো পাতার গাদা থেকে মায়া-তোরঙ বের করে তার ওপরে চেপে বসে।

বসে, তালায় দেয় চাপ। আর, অমনি বাকসোটা সওদাগর-পুত্তুরকে নিয়ে পক্ষীরাজ ঘোড়ার মতো শোঁ শোঁ করে আকাশে ওঠে। সওদাগর-পুত্তুরকে নিয়ে উড়তে উড়তে এসে থামে রাজকন্যের আকাশ-ছোঁয়া, অবাক-করা পুরীর সবার ওপর তলার ছাদে।

মায়া-তোরঙ এক কোণে লুকিয়ে রেখে সওদাগর-পুত্তুর ছাদ থেকে নামে। নেমে, পা টিপে টিপে, পা টিপে টিপে এগোয়। পুরীর বাইরে হাজার শাস্ত্রির পাহারা। ভেতরে কাক-পক্ষী আসতে পায় না, মশামাছি গলে না, সেই পুরীতে বুক-ধুকপুক সওদাগর-পুত্তুর—এঘর ওঘর করে।

পুরীত পুরী নয়, মায়াপুরী ! সওদাগর-পুত্তুর দেখে দেখে অবাক মানে।

দেখতে দেখতে, সওদাগর-পুত্তুর আসে রাজকন্যের ঘরের কাছে। উঁকি দিয়ে দেখে, ঘরের মধ্যে কে? না,—এক কন্যে ! সোনার পালঙ্কে গা এলিয়ে অঘোরে ঘুমোয় কন্যে। জানলা টপকে ঘরে ঢুকে সওদাগর-পুত্তুর, পায়েপায়ে, পায়েপায়ে, এগিয়ে যায়।

কন্যের দুধে-আলতো রঙ, সব্বো অঙ্গে পাগল করা রূপ যেন গলে গলে পড়ে। কন্যে তো কন্যে নয়—ডানাকাটা পরী !

এত রূপ মানুষের হয় !

সওদাগর-পুত্তুর অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

চেয়ে চেয়ে আশ মেটে না, চক্ষে তার পলক পড়ে না। শুধু দেখে আর দেখে।

আর কন্যে, একরাশ সদ্যফোটা শিউলী ফুলের বিছানায় ঘুমোয়।

সওদাগর-পুত্তুর গিয়ে পালঙ্কের উপরে বসে।

এমন সময়,—

হঠাৎ কন্যের গায়ে হাত লাগে। আর, হাতের ছোঁয়া লাগতেই কন্যে ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে। দেখে, পালঙ্কে বসে অজানা, অচেনা কে না কে, এক লোক।

আগ দেউড়ি পাছ দেউড়ি, আশ দেউড়ি পাশ দেউড়ি, আকাশ-ছোঁয়া পুরী ঘিরে খোলা তরোয়াল হাতে হাজার শাস্ত্রি জাগে। সেই-না পুরীতে অচেনা লোক !

দেব, দত্যি না মনিষ্যি?—রাজকন্যে ভয়ে মরে, মুখে বাক সরে না।

সওদাগর-পুত্তুর তখন কন্যেকে অভয় দেয়।

বলে, কন্যে, আমি তোমাদের দেবতা। আমাকে ভয় কী? আকাশ থেকে এসেছি তোমায় দেখতে।

আকাশের দেবতা, সে এসেছে তাকে দেখতে?

www.pathagar.com

শুনে, কন্যের খুশি উছলে পড়ে। আনন্দ আর ধরে না। হাসির ধারায় মুক্তো ঝরে।

তখন—

তখন আর কী? দুজনে সোনার পালঙ্কে বসে কত কথা বলে, কত রাজ্যির গপ্পো বলে, সে গপ্পো আর ফুরোয় না।

গপ্পো করতে করতে রাত ফুরিয়ে বিহান হয় হয়। আর তো থাকা যায় না। সওদাগর-পুত্তুরকে এখন যেতে হবে।

সওদাগর-পুত্তুর কন্যের রূপে পাগল। ছেড়ে যেতে মন সরে না। বলে, কন্যে,—তোমার এমন মন-কেড়ে-নেয়া রূপ! সেই রূপ কিনা আকাশ-ছোঁয়া পাষাণ পুরীতে হাজার সেপাই-এর পাহারায় বন্দী! কন্যে, তোমায় আমি বিয়ে করব।

শুনে, কন্যের আনন্দ আর ধরে না।

আকাশের দেবতা বিয়ে করতে চায় মাটির কন্যেকে! এত ভাগ্যি!

কন্যে বলে, বেশ, করব বিয়ে। কিন্তু আসছে শনিবার তোমায় আবার আসতে হবে আমার এই পুরীতে। সেদিন বাবা-মা আসবেন আমায় দেখতে। আমি বলব তাঁদের সব কথা। আকাশের দেবতার সাথে বিয়ে, সেই বিয়েতে কি অমত করতে পারেন তাঁরা। তক্ষুনি মত দিয়ে দেবেন।

কিন্তু, একটা কথা—

তোমাকে কিন্তু একটা খুব মজার গপ্পো বলতে হবে। আমার বাবা-মা গপ্পো শুনতে ভারী ভলোবাসেন। গপ্পো শুনে যদি তাঁরা খুশি হন, তবেই হবে আমাদের বিয়ে।

শুনে সওদাগর-পুত্তুর বলে, বেশ, তাই হবে। একটা গপ্পোই হবে আমাদের বিয়ের যৌতুক। সে বেশ মজার হবে!

বলে, সওদাগর-পুত্তুর রাজকন্যের কাছ থেকে বিদায় চায়। দেবতা ফিরে যাবে আকাশে, আপন পুরীতে, কন্যে তাকে কি শুধু হাতে বিদায় দিতে পারে?

কিন্তু দেয় কী? ঘরে আছে সোনায় মোড়া, মণি-মুক্তোর কাজ করা এক তরোয়াল। ভেবেচিন্তে কন্যে তাই এনে দেয়।

সওদাগর-পুত্তুরের আকাশ তো তেপান্তরের মাঠের ধারে যে গহীন বন, সেই বনে। গহীন বনে সওদাগর-পুত্তুর একা। বাঘভাল্লুক, সাপ-খোপের ভয় আছে, একটা বিপদ ঘটতে কতক্ষণ! তখন সওদাগর-পুত্তুর জান বাঁচাবে কী দিয়ে?

তাই তরোয়ালটা পেয়ে সওদাগর-পুত্তুর মনে মনে খুশি হয়ে রাজকন্যের কাছ থেকে বিদায় নিল।

বিদায় নিয়ে, বাকসোতে চেপে ফিরে এল বনে।

বনের মধ্যে বাকসোটা লুকিয়ে রেখে সওদাগর-পুত্তুর আবার শহরের পানে পা বাড়ায়। শহরে গিয়ে, কেনে চমৎকার একটা আংরাখা। কিনে, সওদাগর-পুত্তুর আবার বনে ফিরে আসে।

বনে ফিরে সওদাগর-পুত্তুর ভাবতে বসে। শনিবারের মধ্যে একটা মজাদার গপ্পো তৈরি করতে হবে, কিন্তু, কোনো গপ্পোও কি ছাই মনে আসে! সওদাগর-পুত্তুর বসে বসে ভাবে আর ভাবে।

ভাবতে ভাবতে, শেষে—

বেশ মজাদার একটা গপ্পো তৈরি হয়ে যায় শনিবার আসবার আগেই।

www.pathagar.com

তখন আর কী? সওদাগর-পুত্তুর হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

শনিবার আসে।

আকাশ-ছোঁয়া পুরীর মধ্যে রাজকন্যের মহলে, রাজা-রানি, উজির-নাজির, পাত্র-মিত্র দেবতার আশায় বসে থাকে। দেবতা কখন আসে, কখন আসে।

শেষে, মায়া-তোরঙ চেপে দেবতা আসেন! এ দেবতা কে? না,—সেই সওদাগর-পুত্তুর। দেবতা তো আসেন, আর, সঙ্গে সঙ্গে রাজা-রানি, উজির-নাজির, পাত্র-মিত্রের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। কে আগে, কে পরে, দেবতাকে বরণ করবে তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়।

তারপর, অভ্যর্থনার ঘটা থামে। সওদাগর-পুত্তুর গপ্পো শুরু করে।

গপ্পো শুনে, সবাই অবাক মানে। এমন মজার গপ্পোও আছে নাকি?

সওদাগর-পুত্তুর গপ্পো করে আর, শুনে রাজা-রানি হেসে গড়িয়ে পড়ে। উজির-নাজির, পাত্র-মিত্রের নাড়ি ছেঁড়ে ছেঁড়ে।

হ্যাঁ, এমন না হলে গপ্পো। শুনে সবাই খুশি।

আর রাজকন্যেকে বিয়ে করতে বাধা নেই।

আকাশের দেবতার সাথে রাজকন্যের বিয়ের খবর ছড়িয়ে পড়ে। সেই খবরে, নগরে পুরীতে, পথে পথে উছি-আনন্দের জোয়ার বয়। পরদিন সাঁঝের বেলা নগরের পথ-ঘাট, দোকান-পাট, ফুলে-লতায়-পাতায়, সাতরঙা বাতির মালায় হেসে ওঠে।

রাজভাণ্ডার উজাড় করে মণ্ডা-মিঠাই বিলি হয়, রাজ্যির প্রজারা, প্রজাদের ছেলে-মেয়েরা পেট ভরে খায়। খেয়ে, ছেলে-মেয়েরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে বাঁশের বাঁশি, আঁটির ভেঁপু বাজায়।

সওদাগর-পুত্তুর সব দেখে আর ভাবে, আমার জন্যেই চারদিকে এত আলোর ছটা, নগরে নতুন সাজের ঘটা,—ঘরের মানুষ সব পথে! আমিই-বা চুপ করে বসে থাকি কেন? আমাকেও এমন কিছু করতে হবে, দেখে যেন সবার তাক লেগে যায়। এই-না ভেবে সওদাগর-পুত্তুর,—হাউই, পটকা, তুবড়ি—আর যত রাজ্যির আতসবাজি কিনে, বাকসো বোঝাই করে। তারপর সেই বাকসে চেপে হাওয়ার ডানায় ভর করে উড়ে চলে।

উড়ে চলে, আর তাই দেখে, নিচে নগরের লোক ভেঙে পড়ে। ওই তাদের দেবতা যায়! উল্কার চেয়েও জোরে ছোটে দেবতার রথ।

লোকে অবাক হয়ে দ্যাখে আর ভাবে, আমাদের রাজকন্যের কী ভাগ্যি, কন্যের হবে দেবতা-বর!

ওদিকে সওদাগর-পুত্তুর উড়ে উড়ে সেই গহীন বনে গিয়ে নামে। শুকনো লতা-পাতায় মায়া-তোরঙ ঢেকে, শহরের পানে পা বাড়ায়, তার কথা কে কী বলে শুনতে হবে!

সওদাগর-পুত্তুর শহরে যায়। পুরবাসীর কাছে দেবতার কথা পাড়ে। একজন বলে, দেবতার চোখ দুটো সে নিজের চোখে দেখেছে। চোখ তো নয় যেন জ্বলন্ত নক্ষত্র। আর সমুদ্রের ফেনার মতো সাদা। ধপধপে দাড়ি। এমনি ধারা শতেক কাহিনী শোনে সওদাগর-পুত্তুর। শোনে আর মনে মনে হাসে।

পরদিন। রাজকন্যের বিয়ে। সওদাগর-পুত্তুর বনে ফিরে আসে। মায়া তোরঙে চেপে বিয়ে করতে যাবে রাজকন্যেকে।

কিন্তু—

www.pathagar.com

সব্বোনাশ! কোথায় বাকসো কোথায় কী? কোত্থেকে আগুনের একটা ফুলকি উড়ে এসে পড়েছিল তোরঙটার মধ্যে। আর, সঙ্গে সঙ্গে আতসবাজিতে আগুন ধরে মায়া-তোরঙ পুড়ে ছাই!

সওদাগর-পুত্তুর মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে।

এখন উপায়?

উপায় আর কী? মায়া-তোরঙ পুড়ে ছাই, সওদাগর-পুত্তুর উড়তে পারে না, রাজকন্যের কাছে যাবে কী করে!

আর, রাজকন্যে—

সেই আকাশ-ছোঁয়া পুরীর ছাদে দেবতার পথ চেয়ে বসে থাকে।

আজো কন্যে, পুরীর ছাদে বসে এক ধ্যানে আকাশের পানে চেয়ে থাকে, যে পথ দিয়ে দেবতা এসেছিল।

আর সেই সওদাগর-পুত্তুর, সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ায় আর যাকে পায় তাকেই আকাশ-ছোঁয়া পাষাণ-পুরীর কন্যের গপ্পো শোনায়। কিন্তু রাজা-রানিকে যে গপ্পো শুনিয়েছিল, এ গপ্পে সেই হাসি নেই। এ গপ্পে শুধু কান্না ঝরে।

আজো কন্যে পথ চেয়ে আছে, কে জানে এ পথ চাওয়ার শেষ কবে?

www.pathagar.com

www.pathagar.com

চিরায়ত গ্রন্থমালা

এবং

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়

বাংলা ভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ

ও ভাষায় শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে

পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এই বইটি 'চিরায়ত গ্রন্থমালা'র

অন্তর্ভুক্ত

বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

www.pathagar.com